পরমারাধ্য

স্বর্গীয় রামদয়াল পাল

পিতৃদেবের

শ্রীচরণোদ্দেশে
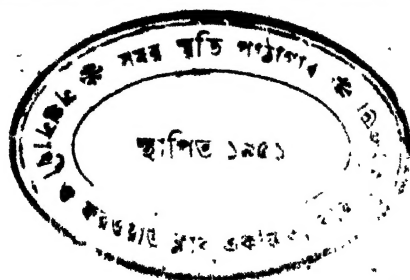
নিবেদন

খোকাখুকুরা গল্প ভালবাসে—ইহা তাহাদের স্বভাব। এইজন্যই বিদ্যালয়ের পড়াশুনার অবকাশকালে গল্পপুস্তক পড়িতে দিয়া তাহাদের মনে আনন্দদানের ব্যবস্থা আছে।

ভূত-পেত্নী বা দৈত্যদানার আজগুবি গল্প পড়িয়া খোকাখুকুদের মন কল্পনা-রাজ্যেই ঘুরিয়া বেড়ায়—বাস্তব জগতের ধার ধারে না। "ছুটির গল্পে" যে কয়টি গল্প আছে তাহাতে আজগুবি কথা কিছুই নাই; গল্প কয়টির উপাদান আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী হইতে গৃহীত। গল্প পড়িয়া যাহাতে হাসি ও আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে ছোটদের মনে উচ্চভাবের উন্মেষ হয়, সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

এই পুস্তকের সাতটি গল্পের মধ্যে প্রথম দুইটি 'বার্ষিক শিশুসাথী'তে বাহির হইয়াছিল এবং অবশিষ্ট কয়টিও 'মাসিক শিশুসাথী'র বিভিন্ন সংখ্যায় বাহির হইয়াছে। সেগুলিকে পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা হইল।

সুখের বিষয় এই যে, সোনার বাংলার ছোট ছোট ভাই-বোনদের নিকট আমার "কাফ্রি-মুল্লুকে" যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। আশা করি, "ছুটির গল্প"ও অনুরূপ আদর-লাভে বঞ্চিত হইবে না।

কল্যাণী
দশহরা—১৩৪৪

বিনীত
বরদাকুমার পাল

সূচীপত্র

খুড়োর চোখ দুইটা বেশ করিয়া বাঁধিল, তারপর
তাহার হাত ধরিয়া চলিল—৩৫ পৃষ্ঠা

ছুটির গল্প

বালকের বীরত্ব

আষাঢ় মাস। বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আকাশ মেঘে ঢাকা। কিয়ৎক্ষণ পর পরই বিদ্যুৎ চমকাইতেছে—আর জোরে জোরে মেঘগর্জ্জন হইতেছে। বৃষ্টি তখনও আরম্ভ হয় নাই—বাতাস ধীর-স্থির।

প্রকৃতির এমনই গম্ভীর ভাব; তা' সত্ত্বেও 'কাইট্'-নামক ষ্টীমারখানি ভাগ্যকুল ষ্টেশন ছাড়িয়া তর্-তর্ করিয়া তারপাশা অভিমুখে চলিয়াছে। নিস্তরঙ্গ পদ্মাবক্ষ ষ্টীমারের চঞ্চলগতিতে তরঙ্গায়িত হইতেছে। তরঙ্গভঙ্গীতে জেলেডিঙ্গিগুলি হেলিতেছে—দুলিতেছে—নাচিতেছে!

গ্রাম্য বালকেরা তীরে দাঁড়াইয়া ষ্টীমারের দৃশ্য দেখিতেছে—কেহ হাতে তালি দিতেছে, কেহ ষ্টীমার লক্ষ্য করিয়া ঢিল ছুড়িতেছে, আবার কেহ কেহ নানারকম অঙ্গভঙ্গীও করিতেছে। গ্রাম্য বধূরা জল লইয়া মন্থর-গতিতে ঘরে চলিয়াছে—আর চকিতে পিছন ফিরিয়া আড়নয়নে 'কোম্পানীর কলের নৌকার' বাহার দেখিয়া লইতেছে।

ষ্টীমার হইতে নদীতীরের ঐ দৃশ্যসমূহ বড়ই মনোরম দেখাইতেছিল—আমরা তাহা বেশ্ উপভোগ করিতে করিতে চলিয়াছি। দেখিলাম সাম্‌নেই একটি প্রশস্ত খাল। অবশ্য পদ্মার বিশালবক্ষে না থাকিলে আমরা উহাকে খাল না বলিয়া নদীই বলিতাম।

খাল এবং নদীর মিলন-স্থলের দৃশ্য বড়ই ভয়ানক। তিনদিকেই বহুদূর-বিস্তৃত জল—জলের পর জল, আবার জল! জলের যেন আর শেষ নাই। দূরে—বহুদূরে আকাশের কোলে কালো মেঘের মত গ্রামের গাছপালার ঘন কৃষ্ণছায়া দেখা যায় মাত্র।

উপরে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ আর নীচে অনন্ত-বিস্তৃত জলরাশি। তাহাতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রবল বাতাসের
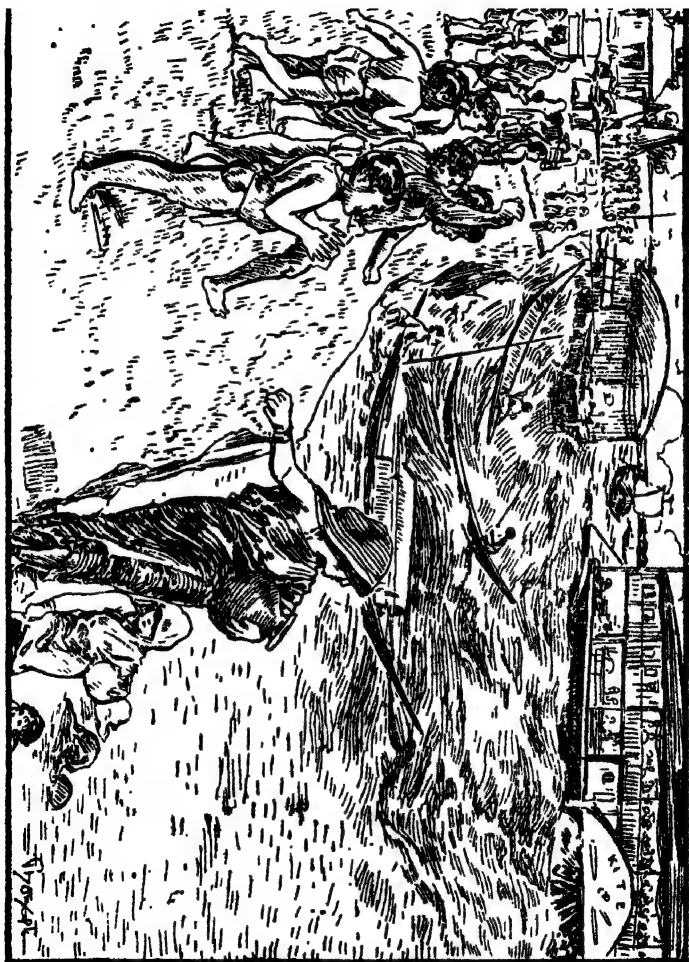
সঙ্গে অল্প অল্প বৃষ্টিও পড়িতে আরম্ভ হইল। তেমনই ভীষণ সময়ে দুইজন পথিক পূর্ব্বোক্ত খাল পার হইবার জন্য উপস্থিত হইল।

পথিক দুইজন বড়ই বিপন্ন ; কারণ খেয়া-নৌকা পরপারে। তেমন সময়ে পারে লইয়া যাওয়ার লোক কোথায় ? কাজেই খেয়া-নৌকার আশায় বসিয়া থাকা বৃথা। নিকটেই দুইটি নয়-দশ বছরের বালক তাহাদের ছোট নৌকা চালাইয়া যাইতেছিল। পথিকদের কাতর অনুরোধে বালক দুইটি তাহাদিগকে পার করিয়া দিতে সম্মত হইল।

পথিকেরা উঠিলে নৌকা পরপারের দিকে ছুটিয়া চলিল। নৌকায় একটি মাত্র বৈঠা ; তাহার সাহায্যেই বালক দুইটি নৌকা চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে ! একজন একটু শ্রান্ত হইলেই অপর জন বৈঠা ধরিয়া বসে। এইভাবে পর্য্যায়ক্রমে তাহারা কাজ করিতেছে।

নৌকাখানি রওনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আরও প্রবল-বেগে বাতাস বহিল—গড়্‌গড়্‌ শব্দে মেঘ ডাকিল। বৃষ্টিও বুঝি সময় বুঝিয়াই মুষলধারে পড়িতে লাগিল। নদী ও খালের জল স্ফীত হইয়া উঠিল—উচু উচু

ঢেউগুলি খ
পড়িতে লা
মিনিটের জন্য
প্রবল বাত
ভ্রূক্ষেপ নাই।
লাগিল। কিন্তু হ
পারিল না। হঠাৎ জ
ও আরোহীরা নিরুপায় হইয়া পড়িল।

ইতিমধ্যে বৃষ্টি একটু কমিলেও বাতাস বহিতেছিল এবং বারংবার মেঘগর্জ্জনও হইতে

উত্তাল জলাবর্ত্তে পড়িয়া নৌকা ডুবিবার উপক্র পথিক ও বালক দুইটির সলিল-সমাধি হইতেও বুঝি আর দেরী নাই। পথিক দুইজন হতবুদ্ধি হইয়া 'ত্রাহি মধুসূদন' জপ করিতে লাগিল। আর এই জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে বালক দুইটি যেই অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইল তাহাই বলিতেছি।

বালক দুইটির ত অন্য চিন্তা করিবার অবসর ছিল না। নিমেষ-মধ্যে উভয়ে লাফাইয়া জলে পড়িল এবং নৌকার সঙ্গে যে ছোট দড়িটুকু বাঁধা ছিল, তাহা ধরিয়া সাঁতার দিতে দিতে কূলের দিকে নৌকা টানিতে লাগিল।

ক একবার
.ছ—আবার
.তেছে ; কিন্তু
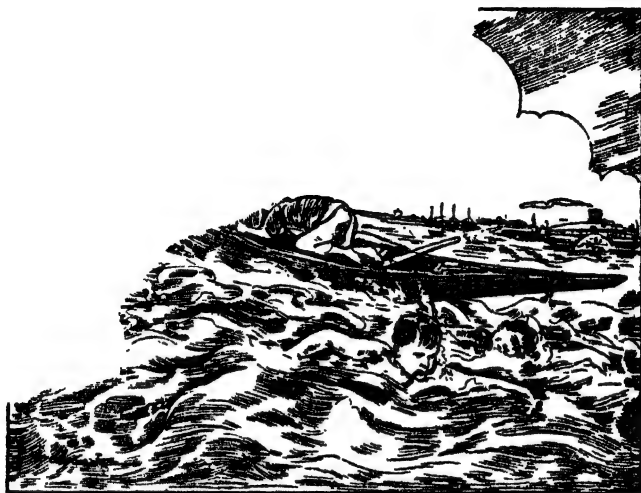
সাঁতার দিতে দিতে নৌকা টানিতে লাগিল

হাত হইতে নৌকার দড়ি ছাড়িতেছে না! সেই দৃশ্য দেখিয়া শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছিল।

যা' হউক, এইভাবে প্রায় আধঘণ্টা পর্য্যন্ত প্রতিকূল স্রোত ও ঢেউয়ের সহিত প্রাণপণে যুঝিয়া বালক দুইটি নৌকা লইয়া তীরে পৌঁছিল—পথিকেরা প্রাণ পাইল।

বালক দুইটির অসম-সাহসিক কার্য্য দেখিয়া আমাদের প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। তাহাদের প্রাণ কত মহৎ—কত উদার! ভাবিলাম, ইহাদের কাজ যদি বীরের কাজ না হয়, তবে কি কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণনাশই বীরের কাজ? প্রাণনাশ অপেক্ষা প্রাণরক্ষায় কি বীরত্ব কম? কিন্তু এহেন বীর বালকের খোঁজ কে রাখে?

কেবলই মনে হইতেছিল, বাংলার ঘরে ঘরে এমন কতশত বীর বালক ইতিহাসের অগোচরে লোক-রক্ষায় ব্যস্ত রহিয়াছে—কে তাহাদের সন্ধান রাখে!

ক্ষতি-পূরণ

জ্যৈষ্ঠের শেষ। গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতা তখনও কমে নাই। প্রভাত হইলেও গ্রামের পথে তখনও লোকের চলাচল স্বরু হয় নাই। চারিদিক্ তখনও আব্ছা-অন্ধকার। তেমন সময়েই রায় মহাশয়ের বহির্বাটীতে গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা একে একে জড় হইতেছিল; ঘুম-কাতরের দলও বাদ পড়ে নাই। কারণ আজ রায় মহাশয়ের একমাত্র পুত্র নবগোপালের বিবাহ। তাই শেষরাত্রি ‹ইতে নহবৎখানায় একতান বাদ্য আরম্ভ হইয়াছে; আবার [illegible]ইতে না-হইতেই ঐ বাদ্যের সঙ্গে বুড়া রসরাজ নট্টের শানাই রাগিণী তুলিয়াছে—

"দে মা যশোদে বিদায়—বিদায় দে জীবন-ধনে!"

সেই গান-বাদ্যের মোহিনী শক্তি—উৎসবের বিপুল আয়োজন ছেলেমেয়েদের আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে।

... ...

বারিদবরণ রায় গ্রামের স্বনামখ্যাত ব্রাহ্মণ জমিদার। গ্রামবাসীরা সাধারণতঃ তাঁহাকে জমিদার ও ধনী বলিয়াই

সম্মান দেখায় বটে, কিন্তু যথেষ্ট ভালবাসে না বা ভক্তিও করে না; কারণ স্বগ্রামের লোকের যাহাতে উপকার হইতে পারে তেমন কোন কাজে কাণাকড়িটিও তিনি কখন খরচ করেন নাই। পাড়াপ্রতিবেশীর বিপদ্-আপদে কোন রকম সাহায্য করা তাঁহার নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য। পরন্তু ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের লোককে তিনি 'ছোটলোক' বলিয়া থাকেন এবং তাহাদের সঙ্গে মেলামেশা করিতেও ঘৃণা বোধ করেন। তবে তাঁহার একটি বিশিষ্ট গুণ আছে—তাহা তাঁহার অতি বড় শত্রুও স্বীকার করিবে। তাঁহার গুণটি এই—যে সকল ব্যাপারে দান করিলে সহজে নাম প্রচার হইতে পারে অর্থাৎ সংবাদপত্রে নাম প্রকাশ পায়—তেমন দানে তিনি মুক্তহস্ত।

অনেক দিন পর্য্যন্ত কোন সন্তানাদি হয় নাই বলিয়া জমিদার-দম্পতি বিষণ্ণ-মনে দিন কাটাইতেছিলেন; কিন্তু শেষে ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিলেন—তাঁহারা একটি পুত্র-সন্তান লাভ করিলেন।

নবগোপাল পিতার একমাত্র পুত্র হইলেও পিতার গুণাবলীর অধিকারী হইতে পারে নাই—কুড়ি বৎসর বয়সে বি. এ. উপাধি-লাভের সঙ্গে সঙ্গে জাতি-ধর্ম্মের

বিচার না করিয়া দুঃস্থের সেবা করাই তাহার কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইল। গ্রামের কাহারও কোন বিপদ্ হইলে, সে মনে প্রাণে তাহার সাহায্যে অগ্রসর হয়; জাতি-ধর্ম্ম বা মান-সম্ভ্রমের অলীক মোহ তাহার কাজে বাধা জন্মাইতে পারে না।

বড় বেশি দিনের কথা নয়—এই ত সেদিন—কৃষ্ণদাস বৈরাগীর মেয়েটি যখন জলে ডুবিল, গ্রামের আর আর সকলের সঙ্গে নবগোপালও পুকুরে নামিয়া কত খোঁজা-খুঁজি করিল! শেষে মেয়েটিকে জল হইতে তুলিয়া—উহার পেট হইতে জল বাহির করিবার জন্য সে উহাকে মাথায় তুলিয়া কেমনভাবে ঘুরাইতে লাগিল! যখন মেয়েটির নাক-মুখ দিয়া পেটের সব জল বাহির হইয়া গেল—মেয়েটির জ্ঞান ফিরিয়া আসিল ও সে কথা কহিল, তখন নবগোপালের আনন্দ দেখে কে? সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। কেহ কেহ বলাবলি করিল—"নবগোপাল আমাদের সামান্য মানুষ নয় রে—নবগোপাল বুঝি বা সেই ব্রজ-গোপাল!"

পিতা কিন্তু পুত্রের এসব কাজ মোটেই পছন্দ করেন না। সময় সময় পুত্রের কাজের প্রতিবাদ করিয়া, তিনি

মাথায় তুলিয়া ঘুরাইতে লাগিল

তাহাকে মৃদু-ভর্ৎসনাও করেন; কিন্তু যাহাতে তাহার মনে বিশেষ আঘাত লাগিতে পারে, তেমন কিছু তিনি বলেন না। কারণ তাঁহার মতের বিরুদ্ধে চলিলেও তিনি ইহা ভাল করিয়াই বুঝেন যে, নবগোপালই তাঁহার একমাত্র বংশধর—আঁধারঘরের আলো—জীবন-মরুর স্নিগ্ধপ্রস্রবণ।

... ...

জমিদারের একমাত্র পুত্রের বিবাহ—সমারোহের অবধি নাই। সকাল হইতে অসংখ্য লোক নানা কাজে খাটিতেছে। কেহ জেলেদের নিয়া পুকুরে মাছ ধরাইতেছে, কেহ সামিয়ানা টানাইবার ব্যবস্থা করিতেছে; কেহ বা গোয়ালাদের আনীত দই-দুধের ওজন দেখিয়া লইতেছে। বাড়ীর কয়েকজন চাকর নিতাই মুদির দোকান হইতে ভারে ভারে ঘি, ময়দা, চিনি, তৈল প্রভৃতি আনিয়া ভাঁড়ার-ঘর বোঝাই করিতেছে। বুড়া দেওয়ানজি মহাশয় খড়ম পায়ে হুঁকা হাতে সব কাজের তত্ত্বাবধান করিতেছেন—কাহারও ত্রুটি দেখিলে সাবধান করিয়া দিতেছেন।

রায় মহাশয় নিজেও কর্ম্মব্যস্ত। সহর হইতে সরকারী-বেসরকারী আফিসের যে সব কর্ম্মচারী বাবুরা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন বা আসিবেন, তাঁহাদের আদর-

আপ্যায়নে অথবা থাকা খাওয়ার ব্যাপারে যাহাতে কোন রকম ত্রুটি না হয়, সে ব্যবস্থায় তিনি লাগিয়া গিয়াছেন।

অন্দর-মহলে মেয়েদের কাজেরও অবধি নাই—ঝি-চাকরাণী সবাই ব্যস্ত। কেহ কুটনা কুটিতেছে, কেহ

বিন্দি আর খেন্তি ঝি অভিজ্ঞতা জাহির করিতে ব্যস্ত

বাটনা বাটিতেছে। কেহ বা সুপারি কাটিয়া পান সাজিবার ব্যবস্থা করিতেছে। ভাঁড়ার-ঘরের পাশে বসিয়া কয়েকজন প্রৌঢ়া গলা ছাড়িয়া গান ধরিয়াছেন। ঝি-চাকরদের রকমারি আলাপে অন্দর শব্দায়মান। ঐ দিকে

দীঘির ঘাটে বিন্দি আর খেন্তি ঝি নূতন ঝিদের বাসন মাজার ত্রুটি দেখাইয়া নিজেদের অভিজ্ঞতা জাহির করিতে ব্যস্ত হওয়ায়, কথায় কথা বাড়িয়া চলিয়াছে; তখন বুড়া ঠানদি' আসিয়া ধমক দিয়া তাহাদের চুপ করাইলেন। অন্দর-মহলের সব রকম কাজের তত্ত্বাবধান করিতেছেন রায়-গৃহিণী—ওরফে নবগোপালের মাতা স্বয়ং।

... ...

বিবাহের দিনে বরের বাড়ীতে এত আড়ম্বর কেন—বিবাহ ত ক'নের বাড়ীতেই হয়। এক্ষেত্রে কিন্তু একটু ব্যতিক্রম হইয়াছে, সে-কথাই বলিতেছি।

ও-পাড়ার হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা বিধুমুখীর সহিত নবগোপালের বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে, তাই এই ব্যতিক্রম। হরিশবাবুর কৌলীন্য বা বংশ-মর্য্যাদা ছাড়া এমন কিছু সঙ্গতি নাই যে, বারিদবাবুর মত ধনী জমিদারের সঙ্গে কুটুম্বিতা করেন। তা' ছাড়া বারিদবাবুর বরাবরের ইচ্ছা—তাঁহার সম-পর্য্যায়ের কোন ধনীর কন্যাকে বধূ করিয়া ঘরে আনিবেন; কিন্তু নবগোপালের ইচ্ছায় এই অঘটন ঘটিয়াছে—বারিদবাবুর ইচ্ছা সফল হইল না।

ক'নে দেখার জন্য যখন বিভিন্ন স্থানে ঘটক-ঘটকী

আনাগোনা করিতেছিল, তখন নবগোপাল জানিতে পারিল যে, হরিশ মুখোপাধ্যায় কন্যাদায়ে পড়িয়া ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছেন। দেশের যেমন অবস্থা তাহাতে বাস্তুভিটা অবধি বিক্রয় করিলেও বরপণ এবং যৌতুক যোগাড় করা তাঁহার পক্ষে কেবল দুঃসাধ্য নয়—অসাধ্যও বটে।

দেওয়ানজি মহাশয়কে বুঝাইতে চেষ্টা করিল···

একথা জানিতে পারিয়া, নবগোপালের পরদুঃখ-কাতর প্রাণ গলিয়া গেল—হরিশবাবুর দুঃখ দূর করিতে সে কৃতসঙ্কল্প হইল—সে স্থির করিল, বিবাহ যদি করিতেই হয়, তবে হরিশবাবুর মেয়ে বিধুমুখীকেই বিবাহ করিবে।

বিবাহের কথা পাকা হওয়ার কয়েক দিন আগের কথা। সে-দিন বৈকালবেলা দেওয়ানজি মহাশয় বৈঠকখানায় বসিয়া কাজ করিতেছিলেন, এমন সময় নবগোপাল তাঁহার কাছে গিয়া বসিল এবং তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, বিধুমুখী সুন্দরী, সচ্চরিত্রা—অন্যদিকে কুলীনের মেয়ে; তাহাকে বধূ-রূপে ঘরে আনিতে পিতার অমত করা উচিত নয়।

দেওয়ানজি মহাশয়ের মুখে ছেলের সঙ্কল্প জানিয়া বারিদবাবু ক্ষুণ্ণ হইলেন বটে; কিন্তু শেষে সাত-পাঁচ ভাবিয়া ছেলের মতেই কাজ করিতে বাধ্য হইলেন। তাহা না করিলে যদি একগুঁয়ে ছেলে বিগ্‌ড়াইয়া যায়—সেই ভয়ও ত আছে!

হরিশবাবুর অসচ্ছলতা বশতঃ সাব্যস্ত হয় যে, বারিদবাবুর গৃহেই বিবাহ হইবে। সেইজন্যই আজ রায় মহাশয়ের বাড়ীতে এত সব আয়োজন—এত সমারোহ।

... ...

সন্ধ্যা হইতে না-হইতে বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের মিলিত শব্দে চারিদিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল। মেয়ে-মহলে হুলুধ্বনি ও গান আরম্ভ হইল। এদিকে বহির্বাটীতে বাজি পোড়ানো

সুরু হইল। কত রকম রকম বাজি—কোনটা আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে জানোয়ার বিশেষের আকার ধরিয়া আকাশে উঠিয়া গেল, কোনটা সাপের মত হইল—কোনটা অগ্নিময় ঝর্ণার সৃষ্টি করিল! আবার কোনটা বিকট শব্দ করিয়া উপরে উঠিল—বহু স্ফুলিঙ্গে বিভক্ত হইল—লাল-

ক'নেকে পাল্কী হইতে নামাইলেন

নীল তারার সৃষ্টি করিয়া আবার আস্তে আস্তে মাটিতে নামিয়া আসিল!! সেই সব চোখ-ঝল্‌সানো রোশনাই দেখি[illegible]র জন্য গ্রামের সকলেই জড় হইয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে রোশনচৌকির বাদ্য সুরু হইল;

হুলুধ্বনি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। রকমারি হট্টগোল ও বাদ্যোদ্যমের মধ্যে বেহারারা "হেঁইও-হো হেঁইও-হো" করিতে করিতে সুরঞ্জিত আস্তরণে আচ্ছাদিত ক'নের পাল্কী লইয়া রায়-বাড়ীর অন্দর-মহলে প্রবেশ করিল। এয়োগণ বারংবার শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি দিয়া ক'নেকে পাল্কী হইতে নামাইলেন।

বহু বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এবং জমিদার মহাশয়ের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-কুটুম্ব সকলেই বিবাহ-সভা জাঁকাইয়া বসিয়াছেন। যথাসময়ে বিবাহ-কার্য্য আরম্ভ হইল। স্ত্রী-আচার ইত্যাদি হওয়ার পর, প্রবীণ পুরোহিত রামনিধি ভট্টাচার্য্য মহাশয় কন্যার পিতা ও বরকে মন্ত্র পড়াইতে লাগিলেন। বিবাহের সময় বাদ্যধ্বনি হইতে থাকিলে বা বাজি পোড়ানোর হট্টগোল হইলে পুরোহিত মহাশয়ের কাজের ব্যাঘাত হইবে; কাজেই তাঁহার নির্দ্দেশমত সাময়িক ভাবে সেই সব বন্ধ রাখা হইল।

এই সময়ে নিমন্ত্রিতদের ভোজন-কার্য্যও চলিতে লাগিল। কাতারে কাতারে লোক আহারে বসিয়াছে, আর কয়েকজন যুবক পরিবেশনে লাগিয়া গিয়াছে। ঠিক সময়ে সকলের খাওয়ার কার্য্য শেষ হইয়া গেল। ঐ দিকে

নিমন্ত্রিতদের ভোজন-কার্য্য চলিতে লাগিল

বিবাহের কাজও শেষ হইয়াছে; মেয়েদের আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে বর-ক’নে বাসর-ঘরে প্রবেশ করিল।

বহির্বাটীতে যাত্রাগান সুরু হইয়া গিয়াছে। বিশিষ্ট শ্রোতারা একধারে বসিয়াছেন। কীর্ত্তনীয়াদের কয়েকজন আসরের মাঝখানে বসিয়া টুং-টাং করিয়া নিজেদের বাদ্যযন্ত্রগুলি ঠিক আছে কিনা দেখিতেছে। গ্রামের ছেলের দল—কেহ আসরের মাঝখানে কীর্ত্তনীয়াদের ঠিক পরেই জায়গা লইয়াছে। কেহ বা সাজঘরের বেড়ার ফাঁকে চুপি দিয়া দেখিতেছে—আবার কেহ কেহ “রাজা আস্‌ছে —সেনাপতি আস্‌ছে” ইত্যাদি বলিতে বলিতে সাজঘরের কাছ হইতে ছুটিয়া আসরের দিকে যাইতেছে।

এইভাবে কিছুক্ষণ কাটিল। তারপর পালা আরম্ভ হইল। ‘রুক্মিণী-হরণ’ পালা হইতেছিল। দুই-তিনটি দৃশ্যের পর জুড়ীরা আসরে দাঁড়াইয়া গান ধরিল। একটু পরে, লম্বাহাতা-ওয়ালা ঢিলা জামা পরা কয়েকটি ছোঁড়াও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল।

যাত্রাগান আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় বাজি পোড়ানো সুরু হইয়াছে। ‘স্র্যা-ৎ স্র্যা-ৎ’ শব্দে আতস-বাজিগুলি জ্বলন্ত সাপের মত আঁকিয়া-বাঁকিয়া আকাশে

উঠিয়া যাইতেছে। যাত্রার আসরে জুড়ী ও ছোকরাদের মোটা-মিহি সুরের গান যাহাদের ভাল লাগিতেছিল না, তাহারা বাজি পোড়ানোর জায়গায় ভীড় জমাইয়াছে।

জুড়ীরা আসরে দাঁড়াইয়া গান ধরিল

এইভাবে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। হঠাৎ দক্ষিণদিক্ হইতে ভীষণ শব্দ উঠিল—

"আগুন! আগুন!!"

সেই দিকের আকাশে আগুনের রক্তিম শিখা স্পষ্ট দেখা দিল। সকলেই সে-দিক্ পানে দৌড়াইয়া চলিল। খানিক যাওয়ার পরেই দেখা গেল, বড় দীঘির দক্ষিণধারের কাঙালী মালীর কুঁড়েঘরে আগুন লাগিয়াছে। কাঙালী—কাঙালীই বটে; তাহার ঘরে যে কি জন্য—কি ভাবে আগুন লাগিল কেহই ঠিক বুঝিতে পারিল না।

…লের দলই নানারকম জল্পনা-কল্পনা করিতে করিতে পরেই জায়গায়… এমন সময় শুনা গেল, কান্ত দাসের বিধবা চুপি দিস কৃষ্ণপ্রিয়া নিজে নিজে বলিতেছে—“আহা বাবুর বাড়ীর বাজিতেই কাঙালীর সর্ব্বনাশ হ'ল গো! শেষরাত্রে বুধী গাইটা কি জানি কেন হাম্বা-হাম্বা কচ্ছিল; তা'কে দেখ্‌তে যেতেই ত দেখনু একটা হাউই কাঙালীর ঘরের চালে গিয়ে পড়্‌ল!”

গ্রামের অনেকেই রায়-বাড়ীতে উপস্থিত ছিল। “আগুন! আগুন!” শব্দ শুনিয়া সকলেই কাঙালীর বাড়ীতে জড় হইল। কেহ হাড়ী, কেহ কলসী, কেহ বাল্‌তি, কেহ ঘটি—যে যাহা পাইল, তাহা লইয়াই আগুন নিবাইতে লাগিয়া গেল। কেহ বা কাঙালীর সামান্য তৈজসপত্র রক্ষার কাজে লাগিল। বিষম হট্টগোল—হৈ

হৈ—রৈ রৈ শব্দে চারিদিক্ তোলপাড়। এমন সময় অৰ্দ্ধদগ্ধ কুটীরের মধ্য হইতে শব্দ হইল—

"গেল গেল! বাছা আমার পুড়ে ম'লো! ওগো কে আছ—বাঁচাও, রক্ষা কর।"

শিশুপুত্র সহ কাঙালীর স্ত্রী ঘরে শুইয়াছিল—আর কাঙালী নিজে বাবুর বাড়ীতে তামাসা দেখিতে গিয়াছিল। কাঙালীর স্ত্রী আগুনের শব্দে হঠাৎ জাগিয়া দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিল; কোন্ দিকে যাইবে—কি করিবে, শিশুকে ধরিবে কি নিজে পালাইবে—কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া, নিতান্ত হতাশভাবে চীৎকার করিতেছে—"বাঁচাও—রক্ষা কর!"

সকলেই আগুন নিবাইতে ব্যস্ত। উহাদের কথা কাহারও মনেই ছিল না। হঠাৎ কাঙালীর বউর কাতর আৰ্ত্তনাদে সকলের খেয়াল হইল; কিন্তু জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিবে কে?

আগুন ক্রমেই ঐ হতভাগ্য শিশু ও জননীকে গ্রাস করিতে লেলিহান জিহ্বা বাড়াইয়া দিল। মুহূৰ্ত্তমাত্র দেরী হইলে দুইটি অসহায় প্রাণী জীবন্ত পুড়িয়া মরিবে! তথাপি উহাদের বাঁচাইবার জন্য কেহ অগ্রসর হইল না।

এমন সময় দেখা গেল সাক্ষাৎ ঋষিকুমারের মত—পট্টবস্ত্র-পরিহিত এক যুবক সবেগে জ্বলন্ত কুটীরে প্রবেশ করিল। একটু পরেই সে চেতনাহীন শিশুটিকে বুকে করিয়া বাহির হইয়া আসিল; যাহাকে সম্মুখে পাইল তাহার হাতে শিশুটিকে দিয়া নিমেষমধ্যে সে পুনরায় কুটীরে ঢুকিল।

সকলে সবিস্ময়ে দেখিল ঐ যুবক আর কেহ নয়—সদ্যঃ-বিবাহিত জমিদার-কুমার নবগোপাল। বিবাহ-বাড়ীর বিভিন্ন রকম আনন্দ-কোলাহল ভেদ করিয়া, বাসর-ঘরের অসংখ্য মেয়ের হাস্য-কলরবের ভিতরেও প্রতিবেশীর কাতর আর্ত্তনাদ—"আগুন আগুন" শব্দ তাহার কানে প্রবেশ করিয়াছিল; এবং সেই শব্দের আকর্ষণেই ছুটিয়া আসিয়া সে কাঙালীর স্ত্রী-পুত্রের উদ্ধার-কার্য্যে লাগিয়া গিয়াছে।

কতকক্ষণ পরে কাঙালীর বউকে লইয়া যখন নবগোপাল বাহিরে আসিল, তখন দেখা গেল—বউএর শরীরের অনেকটা পুড়িয়া গিয়াছে। নবগোপালের দেহও অক্ষত রহে নাই; শরীরের অনেক জায়গা পুড়িয়া ফোস্কা উঠিয়াছে। কিন্তু তাহার সেদিকে মাত্রও ভ্রূক্ষেপ নাই।

পরোপকার-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ জনের আপন দুঃখ-কষ্টের কথা চিন্তা করিবার অবসর কোথায় ?

বাহিরে আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই নবগোপাল মূর্চ্ছিত

কাঙালীর বউকে লইয়া নবগোপাল বাহিরে আসিল

হইয়া পড়িল ; কিন্তু কাঙালীর বউএর তখনও কিছুটা

চেতনা ছিল। সে শুধু বলিতেছিল—"বাবুকে বাঁচাও; বাবু দেবতা—বাবুকে বাঁচাও; আমার খোকাকে দাও।"

দাবানলের মত এই সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। জমিদার-বাড়ীতে হাহাকার পড়িয়া গেল। রায় মহাশয় হতাশ হইলেন। কাঙালীর বাড়ীতে আগুন লাগার কথা তিনি শুনিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে যে নবগোপালও যাইয়া জুটিয়াছে তাহা তিনি ভাবিতে পারেন নাই। শেষে কাঙালীর বাড়ী রক্ষা করিতে যাইয়া ছেলেটি প্রাণ দিতে বসিল—ভাবিয়া ঘৃণায় ও দুঃখে বারিদবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। একটু পরে কয়েকজনে মিলিয়া অতিকষ্টে হতজ্ঞান নবগোপালকে বাড়ীতে লইয়া আসিল।

সেবা-যত্ন চলিতে লাগিল। পরদিন সকালে আটটার পরে নবগোপালের একটু চৈতন্য হইল, সে চোখ মেলিয়া চাহিল। সকলের মন একটু হাল্‌কা হইল; কিন্তু অল্পক্ষণ পরে পুনরায় তাহার চৈতন্য লোপ পাইল। সেই অবস্থায় থাকিয়াই সে একবার আবেগ-জড়িত কণ্ঠে বলিল—"বাবা, এই ক্ষতির জন্য দায়ী কে? আমরাই ত দায়ী। আমাদের দোষেই ত কাঙালীর সব গেল! আমাদের আমোদ-আহ্লাদের ফলে—আমাদের বাজির

আগুনে কাঙালীর সর্ব্বস্ব পুড়্‌ল। আহা বেচারীর শিশুটি —বেচারীর বউটি—তারা কি বেঁচে আছে বাবা ?”

উপস্থিত প্রতিবেশীদের মধ্যে একজন জানাইল যে, কাঙালীর ছেলেটি ভালই আছে—বউটির শরীরও বেশি পোড়া যায় নাই ; সে ক্রমশঃ সুস্থ হইতেছে। কথা কয়টি শুনিয়া নবগোপাল যেন আশ্বস্ত হইল—একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া, অতিকষ্টে পাশ ফিরিয়া শুইল।

... ...

দশ দিন পরের কথা। ডাক্তার-কবিরাজের যত্নে নবগোপালের পোড়া-ঘা অনেকটা শুকাইয়াছে ; কিন্তু বুকের কাছের খানিকটা ঘা আর কিছুতেই সারিতেছে না—কোন ঔষধেই ফল হইল না। তাহার গায়ে তখনও সামান্য সামান্য জ্বর আছে ; আর মাঝে মাঝে সে অজ্ঞান হইয়াও পড়ে। চেতনাহীন অবস্থায় থাকিয়াই সে সময় সময় পিতার উদ্দেশ্যে বলিত—“ক্ষতি পূরণ করেছেন কি বাবা ? কাঙালীর দারুণ ক্ষতি হয়েছে—তার ঘর জ্বলে’ গেছে !—তার সর্ব্বস্ব গেছে !! সেই ক্ষতি পূরণ না কর্‌লে—তা’কে নূতন ঘর তৈরী ক’রে না দিলে, আমি ভাল হ’ব না বাবা। তার দুঃখের ভার—তার

বুকের বোঝা না কমলে আমার বুকের ঘা কক্‌খনো সারবে না বাবা !”

রায়-গৃহিণী কথাগুলি শুনিলেন। স্বামীকে তিনি অনেক বুঝাইলেন। দেওয়ানজি মহাশয়ও বলিলেন—“হয়ত খোকার কথাই ঠিক। কাঙালীর দুঃখ এ যেমনভাবে নিজের ব’লে ভাব্‌ছে, তাতে ওর দুঃখ না ঘুচ্‌লে এর মনে শান্তি হবে না ! মানুষের রোগ-ব্যাধি অনেক সময় মনের শান্তিতেও দূর হয়।”

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া রায় মহাশয় কাঙালীর ঘর তৈয়ারীর হুকুম দিলেন। অবিলম্বে কাঙালীর কুঁড়েঘরের বদলে ভাল ঘর তৈয়ারী হইল। কাঙালীর বউ আগেই সুস্থ হইয়াছিল ; কাজেই তাহার সব দুঃখ ঘুচিয়া গেল।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, কাঙালীর ঘর তৈয়ারীর সঙ্গে সঙ্গে নবগোপালও নিরাময় হইয়া উঠিল ! ঔষধের গুণেই হউক, কোন দৈবশক্তিতেই হউক—অথবা ঠাকুরের পায়ে কাঙালীর প্রাণখোলা প্রার্থনার জোরেই হউক, নবগোপালের দেহে আর ক্ষতের চিহ্নটিও রহিল না ! কাজেই রায়-পরিবারে পুনরায় শান্তি দেখা দিল।

দুর্গার দুর্গতি

আমাদের গ্রামের দুর্গা খুড়ো ওরফে দুর্গাচরণ ভূঁয়া খুবই নামজাদা লোক। বিরাট ভুঁড়িটির জন্যই ছেলে-বুড়া সকলে একডাকে তাহাকে চিনে। পূরা সাড়ে ছাপ্পান্ন ইঞ্চি মোটা ভুঁড়িটি বহন করিয়া আড়াই হাত লম্বা দুর্গা খুড়ো যখন রাস্তা দিয়া চলে, তখন মনে হয়, বুঝি বা দুইমণ তূলা বোঝাই একটা বস্তা রাস্তায় হাঁটিয়া চলিতেছে!

লোকটি খুবই সাদাসিধা—সাত চড়ে রা'টি নাই; তাতে আবার নেহাৎ গরীব। সংসারে তাহার একটিও ছেলেপুলে নাই। তুলসীতলার মাটি দিয়া বুকে পিঠে কপালে ফোঁটা কাটিয়া এবং টিকিটিতে হাত বুলাইয়াই তাহার সারা সকালবেলাটা কাটে; আর দিনের বাকী সময়টা কাটে প্রতিবেশীদের বাড়ীতে খুটিনাটি ফরমাস খাটিয়া। কেহ কিছু দিলে হাসিমুখে বাড়ী নিয়া যায়, আর না দিলেও কিছু বলে না—এমনই সরলপ্রাণ সে!

খুড়োর গৃহিণীর স্বভাব কিন্তু ঠিক তাহার বিপরীত।

পরশ্রীকাতরতা, পরহিংসা, পরনিন্দা—এসব তাহার নিত্য কর্ম্ম। তারপর দুইবেলা খুড়োর সঙ্গে সামান্য সামান্য বিষয় নিয়া বা তাহার পরের বাড়ীতে খাটুনীর প্রতিবাদ করিয়া, দুই-দশবার ঝগড়া না করিয়া জলগ্রহণ করাও যেন তাহার নিয়ম-বিরুদ্ধ। বারমাস—তিন শ' পঁয়ষট্টি দিন সেই একই ভাবে কাটে। গোবেচারী দুর্গাচরণ কি আর করে—কখনও বা কালে-ভদ্রে দুই-এক কথা বলে, আর নীরবে সহ্য করিয়াই থাকে বেশি দিন।

গত বৎসর পূজার আগে যা একটা কাণ্ড হইল, তাহার কথাই বলিতেছি।

দুর্গা-বৌ আব্‌দার ধরিয়া বসিল—পূজার সময় পঁচিশ ভরি ওজনের একটা রূপার হাঁসুলি চাই-ই। পাশের বাড়ীর বামী পিসীর নাতজামাইর ভাই হরে মুদি—সেও দিল বৌকে পাঁচ ভরি ওজনের ইয়া-বড় এক নথ। কাজেই হরের বৌর গয়নার পাঁচগুণ ওজনের একটা হাঁসুলি চাই-ই চাই। হরে মুদি থাকে ত সেই দাদার শ্বশুর-বাড়ী, আর করে ত সেই তেল-নুনের দোকান; সে-ই দিল বৌকে একটা পাঁচ ভরি ওজনের নথ, আর দুর্গা-বৌ সেই হরে মুদির বৌয়ের অপেক্ষা কম কিসে?

গরীব বেচারী কি করিয়াই বা বৌয়ের এহেন অন্যায় আব্‌দার রক্ষা করে ? কাজেই এই ব্যাপার লইয়া দুই-জনের সে কি বিষম ঝগড়া ! খুড়ো এক কথা বলে ত বৌ জোর গলায় দশ কথা শুনাইয়া দেয়। হাঁক-ডাক চীৎকার কান্নাকাটিতে পাড়া তোলপাড় !

অবশ্য খুড়ো কোন কথা না বলিলে একতরফা-ঝগড়া হয়ত বেশিদূর গড়াইত না ; কিন্তু কত আর সহ্য করা যায় ? খুড়োর কোন্ দুর্ম্মতি হইয়াছিল, সে বৌয়ের কথায় সায় না দিয়া—একটু প্রতিবাদের সুরই ধরিয়াছিল। তার জন্যই ত এই কাণ্ড ! যেন পটাস-বাজির গুদামে আগুন লাগিল ! হুটপাট করিয়া বৌ অনর্গল বকিয়া চলিল। তারপর তাহার রাগ যখন চরমে উঠিল, তখন খুড়োর পিঠে ঘা কতক বসাইয়াও দিল।

সেই দিন ছিল হাটবার। যাহারা হাটে যাইতেছিল অথবা হাট হইতে ফিরিতেছিল, কান্নাকাটি ও চীৎকার শুনিয়া তাহারা সকলে খুড়োর উঠানে জড় হইল। সকলের মুখেই এক কথা—"কি হ'ল গো—কি হ'ল ?" কিন্তু কে কার কথার জবাব দেয় ? শেষে বামী পিসী ঘরে ঢুকিয়া সব কথা শুনিল এবং খানিক পরে ফিরিয়া

আসিয়া—দরজায় দাঁড়াইয়া, সকলের কাছে খুড়োর ও খুড়ো-গৃহিণীর ঝগড়ার কথা সবিস্তারে বলিল।

সব কথা শুনিয়া সকলে দুর্গা-বৌয়ের ব্যবহারের তীব্র সমালোচনা করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল।

বামী পিসী ঝগড়ার কথা সবিস্তারে বলিল

গৃহিণীর এমন ব্যবহারে কা'র না রাগ হয়? দুর্গা খুড়োর যেমন হইল রাগ—তেমনই হইল দুঃখ। সে বলিল—"দুত্তোর ছাই, এমন অপমান স'য়ে থাকৃব না আর ঘরে।"

কথা কয়টি বলিয়াই—সেই দেড়কুড়ি বছর আগের

পোষাকী ধুতি আর ঠাকুরদাদার আমলের বোম্বাই চাদরখানা গামছায় জড়াইয়া পিঠের উপর বাঁধিল ; তারপর, যে দিকে দুই চোখ যায়, সেই দিক্ পানে চলিল।

... ...

বিরাট ভুঁড়ির বোঝা লইয়া কতদূরই বা আর হাঁটা যায় ? পাশেই ভকতপুর গ্রাম। ঐ গ্রামের কাছাকাছি যাইতে না-যাইতেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। এদিকে পেটের আগুনও জ্বলিয়া উঠিল। পেটের জ্বালা বিষম জ্বালা—ক্ষুধায় খুড়োর পেটের নাড়ীশুদ্ধ হজম হইবার উপক্রম হইল। পা আর চলে না। কাজেই খুড়ো মাঠের ধারে ঝোপের পাশে—ঘাসের উপর শুইয়া পড়িল এবং একটু পরে ঘুমে অচৈতন্য হইল।

বেশি রাত্রে সেইপথ ধরিয়া কে একজন যাইতেছিল। হঠাৎ খুড়োর পায়ের সঙ্গে হুচোট্ লাগিয়া সে হুড়্মুড়্ করিয়া পড়িয়া গেল। পড়িয়া গিয়া তাহার কেমন যেন একটু ভয় হইল—কারণ সে ছিল সেই তল্লাটের নামজাদা চোর—তাহার নাম কালু। 'এমন নিশুতি রাতে তেপান্তরের মাঠের ধারে ঝোপের পাশে কে শুয়ে থাক্‌তে পারে ?'—ভাবিয়া, তাহার মনে কেমন একটু

সন্দেহ হইল। তাই পিছন ফিরিয়া ভাল করিয়া দেখিতেই দুর্গা খুড়ো হাঁকিয়া উঠিল—"কে-ও ?"

চোর বলিল—"তুই কে ?"

—"আমি দুগ্‌গো খুড়ো।"

—"কি চাই তোর ?"

দুর্গা খুড়ো কাতরভাবে কহিল—"কিছু খাবার চাই।"

কালু পাকা চোর। কথা শুনিয়া তাহার ভয় কাটিয়া গেল। কোঁচড় হইতে কয়েক মুঠা চাউল-ভাজা খাইতে দিয়া, সে দুর্গা খুড়োর কাছে বসিয়া তাহার দুঃখের কাহিনী শুনিল ; সব কথা শুনিয়া খুড়োকে আশ্বাস দিয়া, সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিল এবং বলিল—"তোমার কোন ভয় নেই খুড়ো। আমার কথামত কাজ কর। তোমার আবার টাকার ভাবনা কি ! তুমি খানিক এখানে ব'সো, আমি এক্ষুণি আস্‌ছি !"

কথা কয়টি বলিয়াই সে চলিয়া গেল। খুড়ো বসিয়া বসিয়া হাই তোলে আর মশা মারে।

কতক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেল। তারপর কোনও গৃহস্থের সর্ব্বনাশ করিয়া, কতকগুলি গয়নাপত্র আর অন্য সব জিনিসে একটা বড় রকমের পুঁটুলি তৈয়ারী করিয়া,

কালু আসিয়া হাজির হইল। সে আসিয়াই খুড়োকে পুঁটুলিটা লইয়া তাহার সঙ্গে যাইতে বলিল। অবস্থা-বিপর্য্যয়ে পড়িয়া খুড়ো 'চোরের চাকর' সাজিয়া চলিল।

খুড়ো যে নেহাৎই সরল সোজা গোবেচারী লোক, তাহা বুঝিতে কালুর একটুও দেরী হয় নাই। কাজেই তাহারা কোন্ পথ দিয়া কোথায় যাইতেছে খুড়ো যাহাতে শেষে তাহা ঠিক ঠিক প্রকাশ করিতে না পারে —এইরূপ চিন্তা করিয়া, কালু প্রথম হইতেই সাবধান হইতে কসুর করিল না। এক টুক্‌রা কাপড় দিয়া সে খুড়োর চোখ দুইটা বেশ্ করিয়া বাঁধিল, তারপর নিজে তাহার হাত ধরিয়া চলিল।

বাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছিয়া দুর্গা খুড়ো তাহার বাড়ীটা চিনিয়া ফেলিবে ভাবিয়া, হুঁসিয়ার কালু খুড়োকে ভকতপুরের দত্তদের বাড়ীর পাশে বসাইয়া রাখিয়া নিজেই পুঁটুলিটা লইয়া বাড়ীতে গেল। খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া, সে খুড়োর চোখের বাঁধন খুলিয়া দিল এবং হাতে একটা টাকা দিয়া বলিল—"কাল সন্ধ্যায় ফের এখানে এসো, বৌয়ের হাঁসুলির ব্যবস্থা ক'রে দেবো'খন।"

টাকাটি হাতে পাইয়া খুড়োর সে কি আনন্দ! খুড়ো তাড়াতাড়ি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে মাত্র। বৌ তখনও উঠে নাই। তাহার রাগ অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল। কারণ শত ঝগড়া-বিবাদ করিলেও পাঁচবছর বয়সে বিবাহ হওয়ার পর হইতে এই পৌনে দুইকুড়ি বছরের ভিতর, খুড়োকে ছাড়া—এমনভাবে একা একা সে একটি দিনও থাকে নাই। সেই জন্যই তাহার মনটা যেন কেমন-কেমন করিতেছিল।

খুড়ো ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া "ও বৌ—বৌ" বলিয়া ডাকিতেই দুর্গা-বৌ ধড়্‌মড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিল। তারপর যখন নগদ একটি টাকা হাতে পাইল, আর হাঁসুলিটাও পাইবে বলিয়া জানিতে পারিল, তখন বৌয়ের আনন্দ দেখে কে!

সকালবেলা স্নান করিয়া খুড়ো মনের সুখে তুলসী-তলার মাটি দিয়া বেশি বেশি ফোঁটা তিলক কাটিল। তারপর সারা দিনটা কোন রকমে কাটিয়া গেল;—শেষবেলার দিকে চাদরখানা কাঁধে ফেলিয়া—ঠিক যেন চিতাবাঘের ঠাকুরজামাইটি সাজিয়া—ভুঁড়িটি দোলাইতে দোলাইতে, খুড়ো কালুর সহিত দেখা করিতে চলিল।

সন্ধ্যার পরে নির্দ্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছিয়া—অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া খুড়ো কালুর দেখা পাইল না। দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে বিরক্ত হইয়া সে দত্তবাবুদের বৈঠকখানা-ঘরের পিছনে গিয়া বসিয়া পড়িল। ক্রমে তাহার একটু তন্দ্রাও আসিল।

পূজার আর দেরী নাই। দত্ত-বাড়ীর প্রবাসী বাবুরা পূজার ছুটিতে সবাই বাড়ী আসিয়াছেন। তাঁহারা বৈঠকখানায় আসর জমাইয়া বসিয়াছেন, আর চণ্ডীমণ্ডপে নিতাই আচার্য্য, ঠাকুরের গায়ে রং দিতেছে। গ্রামের ছেলের দল মনোযোগ সহকারে রং-দেওয়া দেখিতেছে।

কিছুক্ষণ পরে মেজকর্ত্তা গাড়ু হাতে বৈঠকখানার পিছনদিকে চলিলেন। তাঁহার পায়ের আওয়াজে কালু আসিতেছে মনে করিয়া, খুড়ো আস্তে আস্তে বলিল— "কেও—কালু ভাই নাকি?"

মেজকর্ত্তা, কালু চোরাকে বেশ ভাল রকমই জানেন; তাই কালুর নাম শুনিয়াই "চোর চোর" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

আর যায় কোথায়?—মেজকর্ত্তার সেই হেঁড়ে গলার বাঁজখাই আওয়াজ শুনিয়া সবাই ছুটিয়া আসিল এবং

'চোর চোর' শব্দের কোরাস্ তুলিয়া দুর্গা খুড়োর পিছু পিছু তাড়া করিয়া চলিল।

ভুঁড়ির বোঝা লইয়া খুড়ো খুব বেশি দৌড়াইতে পারিল না—খানিক দূর যাইয়াই বসিয়া পড়িল। বাড়ীর ছোঁড়া-কর্ত্তার দল, আর গাঁয়ের অন্যান্য যাহারা সোরগোল শুনিয়া আসিয়াছিল—তাহারা সুদ্ধ—খুড়োকে আচ্ছা রকম 'উত্তম-মধ্যম' দিয়া পূজার পুরস্কার দিতে ছাড়িল না। খুড়ো ভেউ-ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, তারপর আস্তে আস্তে বলিল—"কত্তা বাবুরা, আমি চোর নই গো—আমি দুগ্‌গো খুড়ো।"

এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া সকলে ত হাসিয়াই খুন! বুড়া কর্ত্তা আলোটা নিয়া তাহাকে বেশ্ করিয়া দেখিলেন, তারপর সকলকে বলিলেন—"মারিস্ নে রে, লোকটা পাকা চোর নয়। দেখ্-না কেমন ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে আছে!"

তাঁহার কথা শুনিয়া দুর্গা খুড়ো সাহস পাইয়া বলিল —"হ কত্তা, ঠিক্ ধরছেন; আমি চোর নই গো—আমি দুগ্‌গো খুড়ো।"

আবার একটা হাসির লহর উঠিল। তারপর খুড়োর

খুড়োর পিছু পিছু তাড়া করিয়া চলিল —৩৮ পৃষ্ঠা

কাছে বসিয়া বুড়া কর্ত্তা আস্তে আস্তে সব কথা শুনিতে লাগিলেন।

সবাই যখন বুঝিলেন লোকটা চোর নয় এবং বিরাট ভুঁড়ি লইয়া পলাইতেও পারিবে না, তখন তাহাকে বুড়া কর্ত্তার 'হেফাজতে' রাখিয়া সকলে সরিয়া পড়িলেন।

... ...

পূজার কয়টা দিন দুর্গা খুড়ো দত্তবাবুদের বাড়ীতেই থাকিল। তাহাকে পরম সমাদরে খাওয়ান হইল। কারণ শ্যামা পিসী বলিয়াছিলেন—"ওর জন্যই তো সর্ব্বস্ব রক্ষা পেয়েছে—তা' না হ'লে কালু চোরা সেই রাত্রে কি সর্ব্বনাশটাই না কর্‌ত!"

আমোদ-প্রমোদের মধ্যে পূজার কয়টা দিন শেষ হইল। বিজয়ার পরদিন দুর্গা খুড়ো বাড়ী রওনা হইলে, বুড়া কর্ত্তা তাহার হাতে বৌয়ের জন্য একখানা শাড়ী দিলেন। মহাষ্টমীর দিন খুড়োকেও একখানা ধুতি দেওয়া হইয়াছিল। আর শ্যামা পিসীও বৌয়ের জন্য কতগুলি খাবার, আর গিল্‌টি-করা একখানা হাঁসুলি দিয়া খুড়োকে বিদায় দিলেন।

খুড়ো বিদায়কালে বাড়ীর সকলকে দণ্ডবৎ হইয়া

প্রণাম করিল। বুড়া কর্ত্তা তাহাকে বলিয়া দিলেন—
"কিছু মনে ক'রো না খুড়ো। মাঝে মাঝে এসো।"

একগাল হাসিয়া খুড়ো উত্তর করিল—"কি আর মনে কর্‌ব কত্তা! এ ক'টা দিন আপনার দোরে বেশ্ সুখেই কেটেছে, কত্তা।"

কাপড়, খাবার আর গিল্‌টি-করা হাঁসুলি পাইয়া বৌ ত আহ্লাদে আটখানা। সে যেন নূতন মানুষটি হইয়া গেল। সেইদিন নূতন শাড়ীখানা পরিয়া খুড়োর পায়ে লক্ষ্মীটির মত প্রণাম করিয়া, খুড়ো-গৃহিণী বলিল—"তোমার সাথে যদি আর কখনও ঝগড়া করি, তবে আমি জগাই ভূঁয়ার মেয়েই নই!"......

কিছুদিন পরে, খুড়োর মুখেই সকলে তাহার দুর্গতি ও বৌয়ের মতি-পরিবর্ত্তনের কাহিনী শুনিয়াছিল।

লোকের মুখে মুখে সেই সব কথা শুনিয়া, কালু—সেই যে কোথায় গা-ঢাকা দিয়াছে, তাহার খোঁজ আজও কেহ পায় নাই। কাজেই আজকাল গ্রামের লোকের নিদ্রা-সুখের বেশি ব্যাঘাত হয় না।

উদার প্রতিশোধ

অনেক দিন আগের কথা।

প্রসিদ্ধ বিশ সনের বানের স্মৃতি তখনও মুছিয়া যায় নাই। দেশের বহু ধন-প্রাণ নষ্ট করিয়া, বানের জল অনেক দিন হয় নামিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহার পর,—দুর্ভিক্ষ, জলকষ্ট আর ম্যালেরিয়া বানের অসম্পূর্ণ কার্য্য শেষ করিতে লাগিয়া গেল। বানের লোনা জলে প্লাবিত হওয়ায় মাঠের সমস্ত শস্য নষ্ট হইয়াছে। ফলে, চারিদিকে বিষম হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। ধনী-দরিদ্র সকলেরই এক অবস্থা। কাহারও ঘরে অন্ন নাই।

ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়ার তাণ্ডব লীলা। একে পেটে অন্ন নাই, তার উপর অপেয় জল পান করিয়া, গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ সবাই ম্যালেরিয়ার কবলে পড়িয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে। কেহ মরিয়া বাঁচিয়াছে—আবার কেহ বা মরিতে মরিতেও বাঁচিয়া যাইতেছে। খড়-বিচালির অভাবে শত শত গরু-মহিষ মরিতেছে। গ্রামের এখানে সেখানে—মৃত গরু-মহিষের পাশে দলে দলে শকুনি-গৃধিনী

ও শৃগাল-কুক্কুর বিকট কোলাহল সহকারে আনন্দের হাট বসাইয়া দিয়াছে।

ঘেঁসেড়া গ্রামের ধর্ম্মদাস মাঝি গরীব চাষী। সংসারে তাহার স্ত্রী ও একটিমাত্র ছেলে হারাধন—বয়স তার দশ বৎসর। নিজের বাড়ীর সংলগ্ন বিঘাখানেক জমির উৎপন্ন শস্যে তাহাদের তিনটি প্রাণীর কোন রকমে দিন চলে। পূর্ব্ব বৎসর অজন্মার দরুণ সামান্য ধানই ঘরে উঠিয়াছিল। স্বামী-স্ত্রী কখনও আধপেটা খাইয়া—কখনও বা না খাইয়া ছেলেটিকে বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল।

এবারের ফসলের অবস্থা একটু ভালই ছিল। তাহা দেখিয়া মাঝি-দম্পতি বেশ খুশীই হইয়াছিল। সামনের ক্ষেতে ধানের সবুজ পাতা দোলাইয়া যখন বাতাস বহিয়া যাইত, তখন মাঝি ও মাঝি-বৌর প্রাণ ভবিষ্যৎ সুখের আশায় নাচিয়া উঠিত। কিন্তু হায়! তাহাদের সেই সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিতে বেশি দেরী হইল না। বানের প্রচণ্ড প্রতাপে ক্ষেতে শস্যের শেষচিহ্নও বিনষ্ট হইল।

তার পরের অবস্থা বর্ণনার অতীত—অনুভূতি দ্বারাই বরং তাহা কতকটা বুঝা যায়। গ্রামের অন্যান্য শত শত পরিবারের মত মাঝি-পরিবারেরও কষ্টের অবধি রহিল

না। ধর্ম্মদাস নিজে ম্যালেরিয়ায় শয্যাশায়ী হইল। সেবা-সমিতির দয়ায় তাহার স্ত্রী ও পুত্রের কোনরকমে আধপেটা খাওয়ার ব্যবস্থা হইল ; আর সে নিজেও তাহাদের দেওয়া কুইনাইনের প্রসাদে সেই যাত্রা বাঁচিয়া গেল। বাঁচিল সত্য ; কিন্তু কঙ্কালসার শীর্ণ দেহ ও পেট-জোড়া প্লীহার ভার লইয়া সে আর আগের মত খাটিতে পারে না।

... ...

কয়েকদিন পরের কথা।

একদিন সকালবেলা ধর্ম্মদাস মাঝি শস্যের দুরবস্থা দেখিয়া দুঃখিতমনে ঘরে ফিরিতেছিল, এমন সময়ে গ্রামের স্বনামখ্যাত মহাজন হরিশ ঘোষ আসিয়া তাঁহার সামনে দাঁড়াইলেন। হরিশ ঘোষকে দেখিয়া ধর্ম্মদাসের মাথায় যেন বাজ পড়িল, তাহার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। স্বয়ং যমরাজকে সামনে দেখিলেও বোধ হয় ধর্ম্মদাস এতটা জড়সড় হইত না।

হরিশ ঘোষ প্রসিদ্ধ সুদখোর। তাঁহার কবলে একবার যেই সম্পত্তি যায়, তাহা সহজে ফিরিয়া আসে না। তিনি বলেন—'আসল টাকা বরং ছাড়া যায়, তবু সুদের কাণা-কড়িটিও ছাড়া যায় না।' একমাত্র পুত্রের অন্নপ্রাশনের

খরচের জন্য এহেন মহাজনের নিকট হইতে ধর্ম্মদাস কিছু টাকা কর্জ্জ লইয়াছিল। এ যাবৎ ঐ ঋণ শোধ করিতে পারে নাই বলিয়াই সে অতটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। হরিশ ঘোষ বিকৃতস্বরে বলিলেন—"কি হে মাঝির পো,

টাকার কি ব্যবস্থা করেছ? তোমার মায়া-কান্না তো অনেকই শুনেছি; আর কদ্দিন শুনব বল দিকিন? মাঘ মাস নাগাদ সুদ-সমেত সব টাকা যদি শোধ ক'রে দিতে না পার, তা হ'লে কিন্তু আমি নালিশ করব।"

করিয়াও ধর্ম্মদাসের বাড়ী আর জমিটুকু তাহাকে পুনরায় বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য অনেক অনুরোধ করিল; কিন্তু মহাজন কোন কথাই শুনিতে চাহিলেন না। বিচারে যাহা তাঁহার প্রাপ্য হইয়াছে, দয়া-দাক্ষিণ্যের খাতিরে তাহা হাতছাড়া করিতে তিনি রাজী হইলেন না।

কৃপানাথ···ঘোষ মহাশয়কে অনেক কথা বলিল

এইভাবে যখন সব রকম চেষ্টা ব্যর্থ হইল—কিছুতেই মহাজনের মন টলিল না, তখন চোখের জলে বুক ভাসাইয়া, ধর্ম্মদাস ও তাঁহার পত্নী যথাসময়ে তাহাদের সামান্য তৈজসপত্র লইয়া—শিশু পুত্রের হাত ধরিয়া ঘরের বাহির

হইয়া পড়িল। বারংবার আপন কুটীরের পানে তাকাইয়া মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ করিতে করিতে নিরাশ্রয় মাঝি-দম্পতি যখন পথে আসিয়া দাঁড়াইল, তখনকার করুণ দৃশ্য দেখিয়া অতি বড় হৃদয়হীনও অশ্রু সংবরণ করিতে পারে নাই।

ধর্ম্মদাসের দুঃখে অনেকেই সহানুভূতি দেখাইল, কিন্তু তাহাতে তাহার দুঃখ ঘুচিল না। তাহার জন্য প্রকৃতই একজনের প্রাণ কাঁদিয়াছিল; সে আর কেহ নহে—পূর্ব্বোক্ত কৃপানাথ মাঝি। সে গৃহহীন, রুগ্ণ ও অনাহারক্লিষ্ট ধর্ম্মদাসকে আপন বাড়ীতে লইয়া গেল। কৃপানাথের বাড়ীতে মাত্রই দুইখানা জীর্ণ কুটীর। তাহারই একখানা সে ধর্ম্মদাসকে ছাড়িয়া দিল।

দিন চলিতে লাগিল। ধর্ম্মদাস এখন জীবিকা-নির্ব্বাহের এক নূতন উপায় ঠিক করিয়া লইয়াছে। কৃপানাথ কয়েকটি টাকা মূলধন দিয়া তাহাকে একটা শাকসব্‌জির দোকান করিয়া দিয়াছে। ক্রোশ খানেক দূরের বাজার হইতে সে আলু, পটল প্রভৃতি কিনিয়া আনে এবং সেই তরকারীর বাজরা মাথায় করিয়া, গ্রামের পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেগুলি বিক্রয় করে। ঐ ভাবে যাহা কিছু লাভ হয় তাহাদ্বারা তাহাদের কোন রকমে দিন চলে।

হারাধনের এখন বয়স হইয়াছে ; সেও মাঝে মাঝে পিতার কাজে সাহায্য করে। এইভাবে কিছুদিন চলিবার পর, হারাধন ভিন্ন গ্রামের পাটের কলে একটি সামান্য চাকরীও যোগাড় করিল। কাজেই ধর্ম্মদাস এখন একটু

গ্রামের পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেগুলি বিক্রয় করে

সুখেই আছে বলিতে হয় ; কারণ বাংলার দরিদ্র পরিবারে উহার বেশি স্বচ্ছলতা খুব কমই হইয়া থাকে।

তারপর প্রায় কুড়িটি বৎসর কালের গর্ভে মিলাইয়া গিয়াছে।

ঐ সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে জগতের অনেক পরিবর্ত্তন—অনেক উন্নতি-অবনতি হইয়া গিয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে ধর্ম্মদাসের দুঃখময় জীবনের অবসান হইয়াছে। তাহার পত্নীও সেই শোক বেশি দিন সহ্য করিতে পারে নাই—এক বৎসর পরেই সেও স্বামীর অনুগামিনী হইয়াছে।

মাতা-পিতৃহীন হারাধন এখনও পূর্ব্বের মতই পাটের কলে কাজ করে। তাহার সততা এবং কর্ম্মদক্ষতার ফলে সে কাজে বেশ উন্নতি করিয়াছে। কিছু টাকা সঞ্চিত হইলে হারাধন বিবাহ করিয়াছিল এবং কালক্রমে দুইটি শিশু পুত্রকন্যার হাস্য-কলরবে তাহার ক্ষুদ্র কুটীরখানি আনন্দময় হইয়াছে। তথাপি হারাধনের মনে শান্তি নাই। পিতার চিরদুঃখময় জীবনের কথা এবং প্রিয় বাস্তুভিটার কথা ভাবিয়া, সময় সময় হারাধন খুবই কাতর হইয়া পড়িত।

মহাজনের কবলে পতিত পৈতৃক ভূমির পার্শ্ব দিয়া প্রত্যহ সকালে কলের কাজে যাইবার সময় হারাধন লোক-চক্ষুর অগোচরে দুই ফোঁটা অশ্রু ত্যাগ করিত

এবং ছল-ছলচোখে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া—একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আপন কাজে চলিয়া যাইত। হায়রে —মানুষের বুকে বাস্তুভিটার এমনই মায়া !

কালের স্রোত বহিয়া চলিল। হঠাৎ কি জানি কেন এবার আবার দেবতা রুষ্ট হইলেন। প্রবল বন্যায় ঘেঁসেড়া গ্রাম ও তৎসন্নিহিত বিশ-পঁচিশখানা গ্রামের দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। বানের তোড়ে মানুষের ঘরবাড়ী ভাসিয়া গেল ; গোলাজাত শস্য নষ্ট হইল। কত গৃহপালিত গো-মহিষ যে স্রোতের মুখে পড়িয়া প্রাণ দিল কে তাহার ইয়ত্তা করিবে ? আর মানুষেরা কি করিল ?—কেহ ঘরের চালে চড়িল, কেহ বা শিশু পুত্রকন্যা কোলে করিয়া গাছের ডালে বসিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে মরণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল ; আবার কেহ কেহ বা নিকটবর্ত্তী রেল-লাইনের পার্শ্বস্থ খালের উঁচু পাড়ে যাইয়া আশ্রয় লইল। আজ ধনী নির্ধন সকলেই সমান বিপন্ন। বিশ সনের বানের চেয়েও এবারের বানের প্রচণ্ডতা প্রবল হইয়াছে বলিয়া প্রবীণেরা বলেন।

অগাধ সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও বুড়া হরিশ ঘোষ এই আকস্মিক বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার কোনও উপায়

করিতে পারেন নাই। দুই পুত্র ও গৃহিণীকে সঙ্গে লইয়া তিনি রেল-লাইন ও খালের মধ্যস্থ উঁচু জায়গায় আশ্রয় লইয়াছেন। পুত্র ও গৃহিণীর তত্ত্বাবধানের জন্য প্রতিবেশী রহিম ব্যাপারীকে সেখানে রাখিয়া তিনি দুইজন লোক লইয়া আরও কিছু জিনিসপত্র সরাইয়া আনিতে পুনরায় বাড়ীতে গিয়াছেন, ঠিক তেমনই সময়ে এক অনর্থ ঘটিল।

হরিশ ঘোষের ছেলে দুইটি বন্যার জলের অতি নিকটে দাঁড়াইয়া সেই জলের আবর্ত্ত দেখিতেছিল, কেহ সেইদিকে লক্ষ্য করে নাই। হঠাৎ ছোট ছেলেটি জলে পড়িয়া গেল, আর বড়টিও তাহাকে ধরিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া পড়িল। কিন্তু জলের প্রবল আবর্ত্তে পড়িয়া, সে ভাইটিকে ধরিতে ত পারিলই না, বরং নিজেই জলের মধ্যে তলাইয়া গেল!

মুহূর্ত্তের মধ্যে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। উহাদের পতনের শব্দ শুনিয়া পিছন দিকে চাহিয়াই ঘোষ-গৃহিণী "হায় হায়" করিয়া উঠিলেন, আর অন্যান্য সকলে "ধর ধর—গেল গেল" বলিয়া খুব চীৎকার করিতে লাগিল; শুধু ঐ চীৎকার পর্য্যন্তই, কিন্তু সেই বিপদে কি যে করিতে হইবে তাহা কেহই ঠিক করিতে পারিল না।

লোকটি যখন ডাঙ্গার দিকে আসিতে লাগিল……

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একজন বলিষ্ঠ পুরুষ নিজ প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া—প্রবল স্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং অতিকষ্টে প্রায় অচেতন অবস্থায় ছোট ছেলেটিকে তীরে লইয়া আসিল। তাহাকে রহিম ব্যাপারীর কোলের উপর শোয়াইয়া দিয়াই লোকটি আবার ঝাঁপ দিল। কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত জলের মধ্যে খোঁজাখুঁজি করার [illegible] ঘোষেদের বড় ছেলেটি [illegible] দুইটি পাওয়া গেল। তাহাকে কাঁধে করিয়া লোকটি যখন ধারে ধীরে ডাঙ্গার দিকে আসিতে লাগিল, তখন ঘোষ-গৃহিণী আকুল আগ্রহে তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন।

দুই দুইটি ছেলেকে নির্ঘাত মৃত্যুর কবল হইতে ফিরিয়া পাইয়া ঘোষ-গৃহিণীর চোখে পুলকাশ্রু বহিতে লাগিল! তিনি হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে সেই পুরুষকে বলিলেন —"কে তুমি বাবা—এই অভাগিনীর যোড়া মাণিককে মরণের মুখ থেকে ফিরিয়ে আন্‌লে?"

লোকটি তখন খুবই ক্লান্ত, তথাপি আত্মপ্রসাদে প্রফুল্ল। বড় ছেলেটিকেও আস্তে আস্তে শোয়াইয়া দিয়া, সে সংক্ষেপে ঘোষ-গৃহিণীর কথার উত্তর দিল—"মা, এই হতভাগ্য—ভিটাছাড়া ধর্ম্মদাসের অধম পুত্র—হারাধন।"

নিমেষমধ্যে ঘোষ-গৃহিণীর পূর্ব্বকথা সবই স্মরণ হইল; ধর্ম্মদাসের উপর তাঁহার স্বামীর অমানুষিক ব্যবহারের কথা মনে করিয়া তিনি লজ্জায় চক্ষু নত করিলেন। হারাধনের নিকট তাঁহারা আজ কত ঋণী! গদ্‌গদকণ্ঠে তিনি হারাধনকে কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু মুখ তুলিয়া দেখিলেন হারাধন আর সেখানে নাই।

বাড়ী হইতে ফিরিয়া হরিশ ঘোষও সকল কথা শুনিলেন এবং ব্যাকুলভাবে হারাধনকে খুঁজিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই তাহার কোন সন্ধান বলিতে পারিল না।

হারাধন উদার—হারাধন মহৎ; তাই উপকার করিয়া সে আজ অপকারের প্রতিশোধ লইল।

রূপের মাহাত্ম্য

আশ্বিন মাস ; শরতের শেষভাগ। 'টাপুর টুপুর' বৃষ্টিপড়া শেষ হইয়াছে। আকাশ সুনীল—পরিষ্কার। বৃক্ষলতা নব পল্লবে সুসজ্জিত। বাগানের গাছে গাছে নানা জাতি ফুল ফুটিয়া অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। শারদীয়া পূজার আর বেশি দেরী নাই।

প্রবাসীরা একে একে স্বগৃহে ফিরিতেছেন। তাই গ্রামের ঘরে ঘরে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদেরই আনন্দ বেশি। কারণ, কাহারও বাবা, কাহারও কাকা,—আবার কাহারও বা দাদা বাড়ীতে আসিবেন ; আসিবার সময় কত সুন্দর সুন্দর জামা-কাপড় আর খেলনা আনিবেন। তাই তাহারা প্রবাসী প্রিয়জনের আগমন-প্রতীক্ষা করিতে করিতে খেলাধূলায় দিন কাটাইতেছে ; পড়া-শুনায় আর তাহাদের মন বসিতেছে না।

তেমনই একটা দিনের কথা বলিতেছি। বেলা প্রায় পাঁচটা বাজিয়াছে। কয়েকটি ছেলেমেয়ে গ্রামের পার্শ্ব

দিয়া প্রবাহিত ছোট নদীটির ধারে, পুলকিত মনে খেলা করিতেছিল। তাহাদের কেহ ছুটাছুটি করিতেছিল, কেহ ফুল ছিঁড়িতেছিল—আবার দুই-একজন রঙিন

প্রজাপতি ধরিবার জন্য উহার পিছনে পিছনে দৌড়াদৌড়ি করিতেছিল।

এমন সময় নদীর ঘাটে একখানা নৌকা ভিড়িল। পাড়ার জনৈক ভদ্রলোক প্রবাস হইতে আসিয়াছেন। কাজেই ছেলেমেয়েরা ছুটিয়া নৌকার ধারে গেল।

নৌকারোহী তীরে নামিয়াই "এই যে আমার মাণিক"

বলিয়া, একটি ছয়-সাত বছরের ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইলেন। আর অমনি ছেলেমেয়েগুলি হিঃ হিঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

উহাদের হাসি দেখিয়া ভদ্রলোকের চমক ভাঙ্গিল। তিনি যাহাকে আপন ছেলে 'মাণিক' মনে করিয়া কোলে লইয়াছিলেন, সে মাণিক নয়—পাশের বাড়ীর 'নিধু'; তবে তাঁহার ছেলে মাণিক ও নিধুর চেহারায় কতকটা সাদৃশ্য আছে। সেই জন্যই ভদ্রলোকের ঐ ভুল হইয়াছিল।

... ...

দুইজন লোকের চেহারার সাদৃশ্যের ফলে জগতে সময় সময় এই ধরণের বহু অভিনব ব্যাপার ঘটিয়া থাকে; তাহারই দুই-একটির কথা বলিব।

জগতে কোটি কোটি লোক বাস করে। তাহাদের কাহারও সঙ্গে কাহারও আকৃতির হুবহু মিল নাই—কোন-না কোন অঙ্গে কিছুটা পার্থক্য থাকেই।

প্রথমতঃ কোনও একটা স্কুলের কথাই ধরা যাউক। সেখানে ত বহু ছেলে একত্রে লেখাপড়া করে। বেলা চারিটা বাজিলেই ছেলেরা দলে দলে স্কুল হইতে বাহির হয়। তখন লক্ষ্য করিলে তাহাদের আকৃতিতে বড়

একটা মিল দেখা যায় না। এইভাবে সভা-সমিতি, হাট-বাজার বা মেলায়ও ত অসংখ্য লোকের সমাগম হয়, কিন্তু তেমন স্থলেও কি ঠিক্ একই চেহারার দুইজন লোক দেখা যায়?

জগতের অসংখ্য মানুষকে বিভিন্ন রূপ প্রদান করিয়া

ছেলেরা দলে দলে বাহির হয়

বিশ্বশিল্পী কি অপূর্ব্ব শিল্প-চাতুর্য্যই না প্রকাশ করিয়াছেন! তথাপি সময় সময় একাধিক মানুষের চেহারায় এতটা সাদৃশ্য দেখা যায় যে, তাহাতে ভগবানের সৃষ্টি-মাহাত্ম্য আমরা ভুলিয়া যাই;—ঐরূপ দুইজন লোক একত্র

থাকিলেও তাহাদের একজনকে চিনিয়া লওয়া আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়।

সাধারণতঃ যমজ ভ্রাতা বা ভগিনীর মধ্যেই এই ধরণের সুসাদৃশ্য দেখা যায়। এমন কি মাতাপিতাকেও যমজ পুত্রকন্যার চেহারার তফাৎটুকু ঠিক রাখিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। ফলে, একের দুষ্টামির জন্য অন্যে শাস্তি ভোগ করে বা একের পেটের অসুখ হইলে অন্যে উপবাসী থাকে।

পর পৃষ্ঠার প্রথম ছবিতে দুইটি যমজ ভ্রাতা মুখোমুখী বসিয়া আছেন। উহাদের একজনের নাম ফিলিপ্—অন্য জনের নাম ওয়াল্টার হ্যারিশ; অবশ্য কে ফিলিপ্ আর কে ওয়াল্টার তাহা আমরা বলিতে পারিব না। উহাদের আকৃতিতে এতটা সাদৃশ্য ছিল যে, উহাদের মা-ও কে ফিলিপ্ আর কে ওয়াল্টার তাহা সহজে ঠিক করিতে পারিতেন না।

ভ্রাতৃযুগলের মধ্যে ফিলিপ্ কোনও ব্যবসায়ীর দোকানে কাজ করিতেন। একবার কাহাকেও কিছু না বলিয়া, তিনি ওয়াল্টারকে নিজ কাজে বদলী দিলেন। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনটি বছর ওয়াল্টার ফিলিপের স্থানে

কাজ করিলেও দোকানের ম্যানেজার বা অন্য কোন কর্ম্মচারী তাহাদের এই চালাকির বিন্দু-বিসর্গও টের পাইলেন না!

এই ত গেল যমজ ভাইদের চেহারার সাদৃশ্যের কথা। যমজ না হইলেও দুইজন লোকের চেহারার মধ্যে এতটা সাদৃশ্য থাকে যে, তাহাদের মধ্যে একজনকে চিনিয়া লওয়া কষ্টকর হয়।

কয়েক বছর আগে, কলিকাতা হাইকোর্টে একটা খুনের মামলার দুইজন আসামীকে সনাক্ত করিতে যাইয়া, জেল-রক্ষীকে গোলমালে পড়িতে হইয়াছিল। ঐ দুইজন আসামীর চেহারায় বিশেষ সাদৃশ্য ছিল না; তবে গোলমাল হইল কেন? জেল-রক্ষী ছিলেন সাহেব, আর আসামীরা ছিল ভারতীয়, তাহাতেই জেল-রক্ষী সাহেবের সনাক্ত করিতে ভুল হইয়াছিল এবং তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে, ভারতীয়দের পক্ষে দুইজন সাহেবের মধ্যে একজনকে সনাক্ত করা যেমন কষ্টকর, সাহেবদের পক্ষেও এদেশ-বাসীদের সনাক্ত করা তেমনই দুঃসাধ্য।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে, দুই বিভিন্ন দেশবাসী হওয়াতে এমন ব্যাপার হইয়াছিল; কিন্তু একদেশবাসী লোকের

মধ্যেও কেবল চেহারার সামঞ্জস্য থাকার ফলে, কেমন এক অভিনব ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহাই বলিতেছি।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে—১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে, বিলাতে কয়েক্‌জন মহিলা বিচারালয়ে অভিযোগ করিলেন যে, একজন লোক প্রবঞ্চনা করিয়া তাঁহাদের অনেক মূল্যবান্ অলঙ্কার ও বহু টাকা-পয়সা আত্মসাৎ করিয়াছে। তাঁহাদের বর্ণনা অনুযায়ী আসামীর অনুসন্ধান চলিতে লাগিল এবং কিছুদিন পরে, এডল্‌ফ্ বেক নামক এক ব্যক্তিকে আসামী সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হইল। এডল্‌ফ্‌কে মহিলাদের নিকট আনা হইলে, মহিলারা নিঃসন্দেহে তাঁহাকে আসামী বলিয়া সনাক্ত করিলেন।

এডল্‌ফের কোন প্রতিবাদই গ্রাহ্য হইল না—বিচারক তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন এবং সাত বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড দিলেন। এডল্‌ফ্ কারাবরণ করিতে বাধ্য হইলেন।

দিন চলিতে লাগিল। ক্রমে বেচারী এডল্‌ফের কারাবাসের সুদীর্ঘ সাতটি বৎসর শেষ হইয়া গেল—তিনি কারামুক্ত হইলেন। কিন্তু অন্য কোনও লোকের চেহারার সঙ্গে তাঁহার সাদৃশ্য থাকার ফলে, অদৃষ্টের ক্রুর

দৃষ্টিতে—কারামুক্ত হওয়ার কিছু দিন পরেই পূর্ব্বকথিত অপরাধের অনুরূপ আর একটি অপরাধে তাঁহাকে জড়িত করিয়া, আসামীরূপে পুনরায় বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। এডল্‌ফ্‌ এবারও বিশেষভাবে প্রতিবাদ করিয়া নিজকে সম্পুর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়া শপথ করিলেন।

এবার বিচারকের মনে কেমন একটু সন্দেহ হইল, তিনি আরও অনুসন্ধানের আদেশ দিলেন। আবার বিশেষভাবে অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। কয়েকদিনের অনুসন্ধানের ফলে আর একটি লোককে গ্রেপ্তার করা হইল এবং বিচারে পরবর্ত্তী লোকটিই দোষী সাব্যস্ত হইল। ঐ লোকটির নাম ছিল উইলিয়ম্ টমাস্। বলা বাহুল্য, এডল্‌ফ্‌ ও উইলিয়মের চেহারার সৌসাদৃশ্যের ফলেই অমন বিচার-বিভ্রাট হইয়াছিল।

পরবর্ত্তী অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল যে, যে অপরাধের জন্য এডল্‌ফ্‌ সাত বৎসর কারাবাসী হইয়াছিলেন—উইলিয়মই ছিল তাহার প্রকৃত অপরাধী। হায় চেহারার সাদৃশ্য!—যার জন্য নিরপরাধকেও অপরাধী সাব্যস্ত হইতে হয়! সুখের বিষয় এই যে, নিরপরাধ এডল্‌ফ্‌কে

শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া, তাঁহাকে পাঁচ হাজার পাউণ্ড বা পঁচাত্তর হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছিল।

চলচ্চিত্রে একজন লোকের কোন একটি ভঙ্গী প্রদর্শনের জন্য অসংখ্য ছবি তোলা হয়; তাহার প্রত্যেকটি ছবির মধ্যে তফাৎ থাকে খুবই কম। ঐ ছবিগুলি পর পর অতি দ্রুতগতিতে দর্শকের চোখের সাম্‌নে দিয়া চলিয়া গেলে, কোনও অভিনেতার একটি মাত্র ভঙ্গী প্রতিফলিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত ফিলিপ্‌ ও হ্যারিশের ছবির নীচে যে ছবিখানি আছে, তাহা দেখিলেও মনে হয় উহা যেন চলচ্চিত্রেরই কোনও অভিনেতার মুখভঙ্গীর দুইটি বিভিন্ন ছবি! আসলে কিন্তু ঐ ছবিটি দুইজন যমজ ভ্রাতার। এই ভ্রাতৃযুগলের চেহারায় কোন তফাৎ পরিলক্ষিত হইতেছে কি?

আরও দুইটি ছবি দেওয়া হইল। তাহার প্রথম ছবিতে দুইটি ও দ্বিতীয় ছবিতে তিনটি শিশুর প্রতিকৃতি রহিয়াছে। উহাদিগকে দেখিয়া মনে হয় না কি যে, উহা একটি শিশুর মুখেরই বিভিন্ন ছবি? মনে হয় না কি

যে, আজকাল যেমন টাকায় আটখানা ফটো তোলা যায়, এগুলিও ঠিক সেই ধরণেরই ছবি ?

বস্তুতঃ উহারা কিন্তু একগর্ভজাত এবং একই বারে প্রসূত পাঁচ ভগিনী ! উহারা আমেরিকার অধিবাসী— ক্যানাডা দেশে উহাদের বাড়ী। ক্যানাডা-গবর্ণমেণ্ট আঠার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত উহাদের লালন-পালনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে উহাদিগকে এক বিশেষ হাসপাতালে বিশিষ্ট চিকিৎসক ও ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে রাখা হইয়াছে। উহাদের বয়স এক বৎসর পূর্ণ হইলে জন্মদিনের উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই মজলিশে উহাদের এই ফটো তোলা হইয়াছে।

পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে কাহারও অন্যের সঙ্গে চেহারার বিশেষ সাদৃশ্য থাকিলে সাবধান হইবেন। নতুবা কখনও হয়ত বেচারী এডল্‌ফের মত দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে।

শাস্তি—কি—শান্তি ?

শান্তিময় শঙ্করপুর রাজ্যের মহা দুর্দ্দিন।

মহারাজ বিক্রমজিৎ আর ইহজগতে নাই। সীমান্তের পার্ব্বত্য বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতে যাইয়া তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। মহারাজ বিক্রমজিতের মত প্রজাবৎসল নৃপতিও শেষে পাষণ্ড গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ হারাইলেন। বিধির বিধান কি দুর্ব্বোধ্য!

মহারাজের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কিষণজিৎ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন—সমারোহের সহিত তাঁহার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইলেন—প্রধান সেনাপতি বিজয়কেতনের সহায়তায় বিদ্রোহীদিগকে দমন করিলেন। সীমান্তে পুনরায় শান্তি স্থাপিত হইল।

মহারাজ কিষণজিতের সুশাসনের গুণে রাজ্যের সর্ব্বত্রই পূর্ণশান্তি বিরাজ করিতেছিল, কিন্তু রাজ্যের এই শান্তি বেশি দিন স্থায়ী হইল না। কোন দুষ্টগ্রহের ক্রুর দৃষ্টিতে রাজ্যে আবার অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

অমরজিৎ মায়ের গলা ধরিয়া দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করেন

মৃত মহারাজের দ্বিতীয়া মহিষী পুত্র অমরজিৎকে সিংহাসনে বসাইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন। সপত্নীপুত্র রাজা হইল, আর অমরজিৎ রাজপরিবারের মধ্যে সামান্য লোকের মত থাকিবে, ইহা তাঁহার প্রাণে সহিল না। তাই তিনি বিষণ্নমনে কাল কাটান। সময় সময় পুত্র অমরজিৎ মায়ের গলা ধরিয়া দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে ছোটরাণীর দুঃখ যেন আরও বাড়িয়া উঠে।

অনেক চিন্তা-ভাবনার পর ছোটরাণী স্থির করিলেন, যে ভাবেই হউক সপত্নীপুত্রকে সরাইয়া অমরজিৎকে সিংহাসনে বসাইতেই হইবে। কাজেই তিনি তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে ছোটরাণীর উদ্দেশ্য সফল হইল। কি উপায়ে যে তিনি প্রধান সেনাপতিকে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না।

সেনাপতি বিজয়কেতন ছিলেন মৃত মহারাজের দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ। সেজন্য তিনি প্রথমতঃ ছোটরাণীর প্রস্তাবিত ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মন ঠিক রাখিতে পারেন নাই—হয়ত অদূর-

ভবিষ্যতে সুখ ও ঐশ্বর্য্যের চরম সীমায় উঠিবার দুরন্ত লালসার মোহে এমন জঘন্য ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন।

... ...

নিশীথ রাত্রি। জীবজগৎ নিদ্রামগ্ন; চারিদিক নিঝুম। কোথাও কিছুর সাড়াশব্দ নাই। কেবল মাঝে মাঝে ঝোপ-জঙ্গলে নিশাচর পশুপক্ষীর চলাচলের মৃদু

অশ্বারোহণে ছুটিয়া চলিলেন

শব্দটুকু মাত্র শুনা যায়। রাজপ্রাসাদের প্রহরীরাও অনেকে সঙ্গীন-কাঁধে অর্দ্ধ-নিদ্রিত। এহেন সময়ে—

ভবিষ্যৎ সুখস্বপ্নে মশ্‌গুল বিজয়কেতন কয়েকজন মাত্র অনুচরসহ ঘুমন্ত মহারাজকে আক্রমণ করিলেন।

এইরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে আক্রান্ত হইয়াও মহারাজ হতবুদ্ধি হইলেন না। অবলীলাক্রমে ষড়যন্ত্রকারীদের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া, তিনি প্রাসাদের বাহির হইয়া পড়িলেন এবং অশ্বারোহণে ছুটিয়া চলিলেন।

এবার ছোটরাণীর আশা পূর্ণ হইল। অপ্রাপ্ত-বয়স্ক কুমার অমরজিৎ সিংহাসনে বসিলেন। অমরজিৎ নামে মাত্র রাজা—সেনাপতি বিজয়কেতনই এখন প্রকৃত-প্রস্তাবে রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা—প্রজাদের দণ্ড-মুণ্ডের মালিক !

এই ক্ষমতালাভেও সেনাপতির বাসনার তৃপ্তি হইল না। শঙ্করপুরের সিংহাসন-লাভের দুরন্ত আশা তাঁহার মনের কোণে উঁকি মারিতেছিল। হায়-রে বাসনা ! —যার ছলনায় মানুষ পশুত্ব প্রাপ্ত হয়।

বিজয়কেতন তাঁহার আশা বেশি দিন মনের মধ্যে পোষণ করিয়া রাখিতে পারিলেন না—কয়েক মাস পরে, একদিন কুমার অমরজিৎকে ঘুমন্ত অবস্থায় আক্রমণ করিয়া কারারুদ্ধ করিলেন।

শঙ্করপুরে বিজয়কেতনের রাজত্ব চলিতে লাগিল।

তাঁহার কঠোর শাসনে প্রজাকুল মর্ম্মাহত হইলেও তাঁহার বাহুবলের ভয়ে প্রকাশ্যে কেহই কিছু বলিতে সাহস করিল না—মৃত মহারাজের কথা স্মরণ করিয়া এবং রাজপুত্রদ্বয়ের অবস্থা চিন্তা করিয়া, তাহারা নীরবে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিল মাত্র।

এতদিনে ছোটরাণীর সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিল। দুধ-কলা দিয়া তিনি যে কাল বিষধর এতদিন সযত্নে পুষিতেছিলেন, সে যে তাঁহারই বুকে বিষদন্ত বসাইয়া দিবে তাহা কি স্বার্থান্ধ ছোটরাণী একবারের জন্যও চিন্তা করিয়াছিলেন ?

... ...

এদিকে কিষণজিৎ কি করিলেন তাহাই বলিতেছি। রাজধানী হইতে বাহির হইয়া তিনি ক্রমাগত চলিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি মুকুট খুলিয়া সাধারণ রাজপুরুষের বেশে চলিলেন।

এইভাবে চলিতে চলিতে সারাদিন কাটিয়া গেল। ক্রমে রাত্রি আসিল। ধরার বুকে সোনার কিরণ ছড়াইয়া আকাশে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইল। তেমন সময়ে তিনি এক বনপ্রান্তে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

একে রাত্রি হইয়া গেল, তাহাতে তিনি সারাদিনের

উপবাসী। অশ্বটিরও সেই একই অবস্থা। পরন্তু সম্মুখেই নিবিড় বন। কাজেই তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। বনপ্রান্তে কোথাও রাত্রি যাপনের উদ্দেশ্যে তিনি অশ্ব হইতে নামিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন—একটি বাণবিদ্ধ হরিণ দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া হঠাৎ মাটির উপর শুইয়া পড়িল।

হরিণের পিছনে ছুটিতে ছুটিতে একটি ভীল-বালক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজপুরুষের বেশে সজ্জিত মহারাজকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া বালকটি একটু থমকিয়া দাঁড়াইল—যেন একটু ভীতও হইল; কিন্তু তিনি তাহাকে অভয় দিলেন এবং হাত ধরিয়া সাদরে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। খানিকক্ষণ উভয়ের মধ্যে কি সব কথাবার্ত্তা হইল। তারপর মহারাজ রাত্রি যাপনের জন্য ভীলদের পল্লীতে গমন করিলেন।

বালকটি ভীল-সর্দ্দার শিওসিংএর পুত্র। মহারাজের পরিচয় জানিয়া এবং তাঁহার বিপন্ন অবস্থার কথা শুনিয়া ভীল-সর্দ্দার খুবই দুঃখিত হইলেন এবং পরম সমাদরে তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন।

মহারাজ কিষণজিৎ এখন বনবাসী। শঙ্করপুরের

খানিকক্ষণ উভয়ের মধ্যে কি সব কথাবার্ত্তা হইল

বিশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী বনমধ্যে থাকিয়া অমরজিতের বন্দী হওয়ার সংবাদ তিনি শুনিতে পাইলেন। রাজ্য ছাড়িয়া বনবাসী হইলেও, এতদিন তাঁহারই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাজ্যশাসন করিতেছেন জানিয়া, কিষণজিৎ কতকটা নিশ্চিন্তই ছিলেন—এমন কি রাজ্য পুনরধিকারের আশাও বুঝি বা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাণপ্রিয় কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বন্দী করিয়া বিশ্বাসঘাতক বিজয়কেতন সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন শুনিয়া, তিনি আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না—রাজ্যাপহারকের দণ্ডবিধান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

ইতিমধ্যে আয়ুধগড়ের সামন্ত-রাজও কিষণজিতের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, শঙ্করপুরের যেই সকল রাজপুরুষের পক্ষে বিজয়কেতনের ব্যবহার দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহারাও কিষণজিতের সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন।

একদিন আয়ুধরাজ, মহারাজ কিষণজিৎকে অনুচরগণ সহ আয়ুধগড়ে যাইয়া অবস্থান করিতে অনুরোধ করেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "যেই ভীল-সর্দ্দার আমায় প্রথম আশ্রয় দিয়েছেন, আমি তাঁর আশ্রয় ছেড়ে

অন্যত্র যাব না।” কাজেই মহারাজের সঙ্গে সকলেই ভীলদের মধ্যে থাকিয়া কাল কাটাইতেছেন।

... ...

শীতকাল। মাঘের অনতিদীর্ঘ দিবাশেষে সূর্য্যদেব পশ্চিম আকাশের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। পথঘাট প্রায় নির্জ্জন। সাঁঝের আঁধার পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসিতেছে। তেমন সময়ে, বিশ্বস্ত অনুচরগণ ও ভীল-সর্দ্দার শিওসিং সহ মহারাজ কিষণজিৎ বনপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। বিজয়কেতনকে তাড়াইয়া কি ভাবে রাজ্যের পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়, তাহারই পরামর্শ করিবার জন্য তাঁহারা সেই স্থানে মিলিত হইয়াছেন।

কিছুক্ষণ নানা কথাবার্ত্তার পর, মহারাজ কিষণজিৎ বলিলেন—“বন্ধুগণ, বনবাসও আমার পক্ষে এতদিন কষ্টকর ছিল না, কিন্তু যখন আমি শুনতে পেলুম পাপিষ্ঠ বিজয়কেতন অমরকে বন্দী ক’রে আমার পূর্ব্বপুরুষদের পবিত্র সিংহাসন দখল করেছে, তখনই আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে—আমি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছি। শয়তানকে তাড়াতেই হবে—কিন্তু বিনা রক্তপাতে। যুদ্ধ কর্‌লে আমার পুত্র-প্রতিম প্রজাদের প্রাণনাশ

হবে। প্রজাদের হত্যা ক'রে কি শেষে শেয়াল-কুকুর নিয়ে রাজত্ব কর্‌ব ? বিনা রক্তপাতে সিংহাসন উদ্ধার হয় কি ক'রে, তারই চেষ্টা কর্‌তে হবে।"

ভীল-সর্দ্দার এবং আয়ুধগড়ের রাজাও মহারাজের কথা সমর্থন করিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ চলিতে লাগিল। তারপর কর্ত্তব্য স্থির করিয়া, সকলে অধিক রাত্রিতে বিশ্রাম করিতে গেলেন।

পরামর্শে স্থির হয় যে, প্রথমতঃ বিনাযুদ্ধে সিংহাসন ছাড়িয়া দিবার জন্য বিজয়কেতনের নিকট পত্রসহ লোক পাঠাইতে হইবে। তারপর বিজয়কেতনের মনোভাব বুঝিয়া পরবর্ত্তী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। কাজেই যথাসময়ে পত্রসহ একজন লোক প্রেরিত হইল। লোকটি তিন দিনে শঙ্করপুরে পোঁছিল।

শীতের সকাল। চারিদিকে সামান্য সামান্য কুয়াসা। অনেকক্ষণ হয় আকাশে সূর্য্য উঠিয়াছে, তথাপি তখনও রৌদ্রের তাপ বাড়ে নাই। সেই সময়ে শঙ্করপুরের অনধিকারী মহারাজ বিজয়কেতন সপারিষদ প্রাসাদের বাহির হইয়া, প্রকৃতির প্রাতঃকালীন শোভা দেখিতে-ছিলেন। ঠিক তেমন সময়ে হৃতরাজ্য মহারাজ

পরামর্শ চলিতে লাগিল

কিষণজিতের প্রেরিত লোক সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল।

বিজয়কেতন লোকটিকে তাহার আগমনের কারণ ব্যক্ত করিতে আদেশ দিলে সে সসম্ভ্রমে মহারাজ কিষণজিতের পত্রখানা তাঁহার হাতে দিল।

বিজয়কেতন পত্রখানি পড়িয়া একটু উপেক্ষার হাসি হাসিলেন এবং সংক্ষেপে বলিয়া দিলেন, "কাপুরুষের হাতে রাজদণ্ড শোভা পায় না।"

যথাসময়ে লোক ফিরিয়া গেল। তাহার মুখে বিজয়কেতনের শ্লেষবাক্য শ্রবণ করিয়া কিষণজিৎ, আয়ুধরাজ এবং ভীল-সর্দ্দার ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। ভীল-পল্লীতে 'সাজ-সাজ' রব উঠিল। কালবিলম্ব না করিয়া, তাঁহারা সসৈন্যে শঙ্করপুরের দিকে যাত্রা করিলেন।

... ...

একে শীতের রাত্রি, তাহাতে আবার কৃষ্ণপক্ষ। রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে ; কিন্তু তখনও কৃষ্ণা দ্বাদশীর ক্ষীণ চন্দ্রমার উদয় হয় নাই। চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন। নিয়ত জন-কোলাহল-মুখর শঙ্করপুর রাজ্যের রাজধানী সম্পূর্ণ নীরব। নগরবাসীরা গাঢ় নিদ্রামগ্ন।

কিষণজিতের প্রেরিত লোক সেখানে উপস্থিত হইয়া
তাঁহাকে অভিবাদন করিল।

এমন কি, রাজধানীর প্রহরীরাও সুপ্তির কোলে ঢলিয়া পড়িতেছিল।

রাজধানীর অদূরবর্ত্তী বিস্তৃত বনভূমিতে কিন্তু তেমন সময়েও অসংখ্য লোকের সমাগম হইতেছিল। বহু লোকের উপস্থিতি সত্ত্বেও সেখানে পূর্ণ নীরবতা বিরাজ করিতেছে! এমন নিস্তব্ধ নিশীথে কে উহারা বনভূমিতে একত্রিত হইয়াছে ?

উহারা আর কেহ নহে—উহারা মহারাজ কিষণজিৎ, আয়ুধরাজ ও ভীল-সর্দ্দারের বিশ্বস্ত অনুচর ও সৈন্যদল। তাহাদের হাতে সুতীক্ষ্ণ বর্শা, শাণিত তরবারি, দুর্ভেদ্য ঢাল, মুক্ত কৃপাণ আর জয়পতাকা। তাহাদের কেহ বর্ম্ম-পরিহিত—কেহ বা অর্দ্ধনগ্ন ; কেহ গৃহবাসী—কেহ বা বনবিহারী।

কিছুক্ষণ পরে সৈন্যেরা দুই দলে বিভক্ত হইল। তারপর প্রাসাদ-প্রাচীরের গা ঘেঁসিয়া—পিপীলিকা-শ্রেণীর মত একজনের পিছনে একজন—তার পিছনে আর একজন—এইভাবে সারি বাঁধিয়া, তাহাদের একদল গেল দক্ষিণ দিকে প্রধান তোরণের দিকে এবং অপর দল চলিল উত্তর দিকে প্রাসাদের পিছনের তোরণের পথে। প্রথম

দলে চলিলেন সসৈন্যে ভীল-সর্দ্দার ও মহারাজ কিষণজিৎ স্বয়ং—আর অন্য দলে নেতৃত্ব করিতেছিলেন আয়ুধরাজ।

আয়ুধরাজের সৈন্যদল পৃথক্ পথ ধরিবার পূর্ব্বে, মহারাজ কিষণজিৎ আর একবার আয়ুধরাজকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ উপস্থিত হইলেও কোন সৈন্য যেন শঙ্করপুরের একটি নগণ্য সিপাহীরও প্রাণ সংহার না করে। তিনি তাঁহাকে আরও বুঝাইলেন যে, দৈবক্রমে তিনি রাজ্যচ্যুত হইয়া বনবাসী হইলেও তাঁহার প্রজাদের হৃদয়-রাজ্যে তাঁহার আসন সুরক্ষিতই আছে। কাজেই শঙ্করপুরবাসীদের অণুমাত্র অনিষ্টও তাঁহার অসহ্য দুঃখের কারণ হইবে।

মহারাজের কথা শেষ হইলে আয়ুধপতি মস্তক অবনত করিলেন এবং তাঁহার সৈন্যেরাও নতমস্তকে স্ব স্ব তরবারি স্পর্শ করিয়া বুঝাইয়া দিল যে, তাহাদের দ্বারা মহারাজের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইবে।

এইরূপ ভাবে নির্দ্দেশদান ও সৈন্য সমাবেশের পরেই আরম্ভ হইল মহারাজ কিষণজিতের প্রকৃত অভিযান।

... ...

প্রাসাদের সুকোমল শয়নে বিজয়কেতন তখন গাঢ়

নিদ্রিত, এমন সময় প্রাসাদের প্রধান তোরণে ভৈরব রবে রণ-দামামা বাজিয়া উঠিল। প্রহরীগণের বাধাদান সত্ত্বেও ভীমবাহু ভীলগণ সজোরে সিংহদ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

প্রথমে ভীল-সর্দ্দার প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে সারি সারি ভীল-সৈন্য এবং সকলের পিছনে রহিলেন মহারাজ কিষণজিৎ। প্রাসাদে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদলের মিলিতকণ্ঠে ভীষণ শব্দ হইল—"মহারাজ কিষণজিৎ কি জয় !—ভীল-সর্দ্দারজী কি জয় !!"

অকস্মাৎ প্রধান তোরণে রণ-দামামার শব্দ শুনিয়া পশ্চাতের তোরণের প্রহরীরাও শশব্যস্তে সেই দিকে ধাবিত হইয়াছিল। সেই সুযোগে আয়ুধরাজের সৈন্যেরা অতি নীরবে মই বাহিয়া একে একে প্রাচীরের উপরে উঠিল এবং আবার তেমনি নীরবে প্রাচীর হইতে ভিতরে নামিয়া পড়িল।

আয়ুধরাজের সৈন্যদের প্রায় সকলেই যখন প্রাচীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, ঠিক সেই সময়েই প্রধান ফটকে ভীল-সৈন্যগণের জয়ধ্বনি উঠিল—"মহারাজ কিষণজিৎ কি জয় !—ভীল-সর্দ্দারজী কি জয় !!"

সেই শব্দে পুলকিত আয়ুধরাজের সৈন্যদল আকাশ-

সারি সারি ভীল-সৈন্য ও সকলের পিছনে ৮২

বাতাস কাঁপাইয়া—যেন ভীল-সৈন্যদের জয়ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিয়া, শব্দ করিল—"মহারাজ কিষণজিৎ কি জয় ! আয়ুধপতি কি জয় !!"

সেই শব্দে পশুপক্ষী কোলাহল করিয়া উঠিল—নগরবাসীরা চমকিয়া জাগিয়া উঠিল—মায়ের কোলে ঘুমন্ত শিশুও বুঝি কাঁদিয়া ফেলিল—আর সেই শব্দে বীর বিজয়কেতনের প্রাণেও ভীতির সঞ্চার হইল। সহসা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তিনি বাহির হইতেছিলেন—কিন্তু পারিলেন না। ততক্ষণে ভীল-সর্দ্দার সিংহবিক্রমে লাফাইয়া গিয়া বজ্রমুষ্টিতে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন ! বিনা-রক্তপাতেই রাজধানী অধিকৃত হইল। মহারাজ কিষণজিতের ইচ্ছা পূর্ণ হইল।

মুহূর্ত্তমধ্যে সব গোলমাল থামিল—সকলেই নীরব।

মহারাজ কিষণজিৎ প্রথমেই কারাগারে প্রবেশ ক[illegible]য়া অমরজিৎকে মুক্ত করিলেন এবং সেই কক্ষেই [illegible] বিজয়কেতনকে রাখিবার আদেশ দিলেন।

অমরজিৎ কারাগার হইতে বাহির হইয়াই [illegible] পায়ে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। মহারাজও ভ্রা[illegible] বুকে জড়াইয়া ধরিয়া ছোট-মায়ের মহলে গমন করি[illegible]।

ছোটরাণী ইতিমধ্যে সমস্ত ব্যাপারই শুনিয়াছিলেন ; শুনিয়া তিনি যেন মরমে মরিয়া গেলেন। হর্ষ-লাজে তাঁহার চক্ষু অবনত হইল। তিনি মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিলেন না। এই অনর্থের কারণই যে তিনি—তাঁহার জন্যই যে কিষণজিতের বনবাস-কষ্ট এবং অমরজিতের কারা-যন্ত্রণা ! পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার অনুশোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহার দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছিল।

কিষণজিৎ সকলই বুঝিতে পারিলেন ; তাই বলিলেন —"মা ! রামের বনবাস যেমন বিধির বিধান—কৈকেয়ী নিমিত্ত মাত্র, তেমনি আমাদের কষ্টের জন্য আমাদের অদৃষ্টই দায়ী। আপনার কোন দোষ নেই। দুঃখ করবেন না, মা। শান্ত হোন—অমরকে কোলে নিন্।"

ছোটরাণী বেদনা-কাতর-কণ্ঠে বলিলেন—"বাবা কিষণ, আমি পাপীয়সী, আমাকে হত্যা কর। আমার মত স্বার্থান্ধ নারীর মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। আমি স্বার্থের মোহে সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী তোমায় কত যন্ত্রণাই না দিয়েছি ! আমার মত মাকে হত্যা কর্‌লে তোমায় মাতৃবধের পাপ স্পর্শ কর্‌বে না।"

কিষণজিৎ আবেগ-জড়িত স্বরে কহিলেন—"ছোট-মা,

আপনি ধৈর্য্যহারা হবেন না ; অমরকে কোলে নিন্। এরাজ্য মা তারই, আমি তাকেই সিংহাসনে বসিয়ে রাজকার্য্যের তত্ত্বাবধান কর্‌ব মাত্র।”

অমরজিৎ নতজানু হইয়া বলিলেন—“দাদা—দাদা ! ওকথা আর মুখে আন্‌বেন না। এরাজ্য আপনারই ; আমি আপনার সেবক—দাসানুদাস। মায়ের অপরাধ ক্ষমা করুন।”

কিষণজিৎ কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ছোটরাণী বাধা দিয়া বলিলেন—“বাবা ! এ পাপীয়সীকে যদি ক্ষমাই করেছ, তবে আর দেরী কেন ? পূব আকাশে প্রভাত-সূর্য্যের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তোমার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়ে আমার কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বার সুযোগ দাও, বাবা।”

কিষণজিৎ আর কিছু বলিলেন না। ছোটরাণীর ইচ্ছাই পূর্ণ হইল। প্রভাতে সমবেত প্রজাবৃন্দ, সৈন্যদল ও রাজপুরুষগণের বিপুল জয়ধ্বনি ও আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে মহারাজ কিষণজিৎ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন।

... ...

তারপর এক সপ্তাহ গত হইয়াছে। আজ রাজদ্রোহী

বিজয়কেতনের বিচার। রাজসভায় লোকে লোকারণ্য। সেপাই-শান্ত্রী, আয়ুধরাজ, ভীল-সর্দ্দার এবং তাঁহাদিগের অনুচরগণ হইতে আরম্ভ করিয়া রাজ্যের প্রজাসাধারণ সকলেই বিচার দেখিবার জন্য সভায় সমাগত।
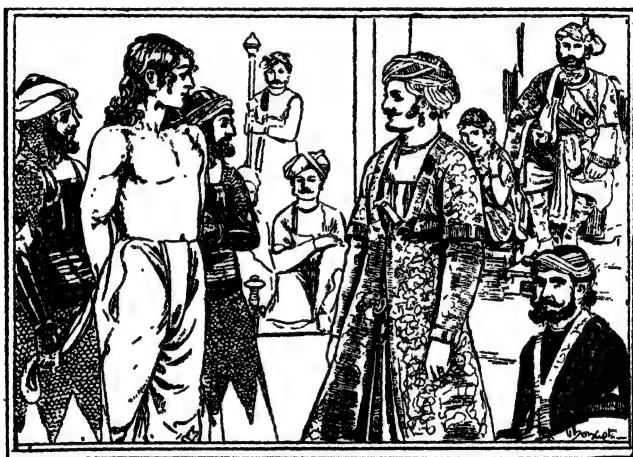
বিজয়কেতনকে রাজসভায় আনয়ন করিল

মহারাজ কিষণজিৎ সিংহাসনে উপবিষ্ট। মন্ত্রী ও অন্যান্য রাজপুরুষগণ স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত; কিন্তু সকলেই নীরব। এমন সময় কারাধ্যক্ষের নির্দ্দেশক্রমে দুইজন প্রহরী বন্দী বিজয়কেতনকে রাজসভায় আনয়ন করিল।

সভাস্থল নীরব। সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া হঠাৎ বিজয়কেতন মহারাজের দিকে চাহিয়া বিকৃতস্বরে কহিলেন —"মহারাজ! এ পাপিষ্ঠের আর বিচার কি—দণ্ডই বা কি ?—প্রাণদণ্ড ? হ্যাঁ, তা-ই ; না—কেবল প্রাণদণ্ডই যথেষ্ট নয়। এ নরপিশাচকে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে শেয়াল-কুকুরের মুখে ফেলে দিন্। আমি বিশ্বাসঘাতক—আমি শয়তান—আমি নরকের কীট।"

মহারাজ গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"সেনাপতি, একথা সত্য যে, আপনি বিশ্বাসঘাতক—আপনি রাজদ্রোহী! তথাপি আপনাকে প্রাণদণ্ড দেব না। কারণ, আপনার দেহের একবিন্দু রক্তও যেখানে পড়্‌বে, সেখানেই লোকচক্ষুর অগোচরে শত শত বিশ্বাসঘাতকের জন্ম হবে। তেমন দণ্ড আমি দেব না। আপনার উপযুক্ত শাস্তির বিধান আমি কর্‌তে পার্‌ব না—ভগবানই কর্‌বেন। আমি আপনাকে ক্ষমা কর্‌লুম। এখনই আপনি এ রাজ্য ছেড়ে চ'লে যান ; এখন থেকে আপনি মুক্ত—স্বাধীন।"

কথা শেষ করিয়া মহারাজ স্বহস্তে বন্দীর শৃঙ্খল খুলিয়া দিলেন। বিজয়কেতন আর কিছু না বলিয়া নীরবে সভাস্থল ত্যাগ করিলেন। সভাস্থ সকলে বিচার-ফল

দেখিয়া, বিস্ময়ে অবাক্ হইল এবং বারংবার মহারাজের দিকে ও বিজয়কেতনের দিকে তাকাইতে লাগিল।

... ...

তারপর বহুদিন চলিয়া গিয়াছে। শঙ্করপুরে আর কোন গোলমাল নাই। মহারাজ কিষণজিৎ নিরুপদ্রবে রাজত্ব করিতেছেন। বিজয়কেতন কোথায় চলিয়া গেলেন কেহই তাহার সন্ধান করিল না।

কিছুদিন পরে দেখা গেল—রাজপ্রাসাদের পার্শ্ব দিয়া প্রত্যহ নিশাশেষে, এক মুণ্ডিতমস্তক বলিষ্ঠদেহ সুন্দর সাধুপুরুষ ক্ষমার অবতার গৌর-নিতাইয়ের মধুর লীলা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে আপনমনে কোথায় চলিয়া যাইত। প্রাচীনেরা বলেন—"এই সাধুপুরুষই সেই বিজয়কেতন!"

ক্ষমার কি অপূর্ব্ব মহিমা!—যাহার অমৃত-স্পর্শে স্বার্থপর নরপিশাচ হয়—দেবপ্রকৃতি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। মহারাজ কিষণজিতের শাস্তিই বা কি অপূর্ব্ব! উহা শাস্তি—কি—শান্তি, তাহা কে বলিয়া দিবে ?

অকাল-বোধন

ঘোষেদের ছোট খুকী লীলারাণীর মেয়ের বিবাহ।

তাই সকাল হইতে লীলারাণীর কাজের আর অন্ত নাই। নিমন্ত্রিতদের খাওয়া-দাওয়া বা আদর-আপ্যায়নের যাহাতে কোন ত্রুটি না হয়, সেই জন্যই সে প্রাণ দিয়া খাটিতেছে। সকালে মা কিছু খাবার দিয়াছিলেন; খাবার খাবারের জায়গাতেই পড়িয়া আছে—সে খায় নাই। খাওয়ার অবসর কোথায়?

গত বৎসর গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী আসিবার সময়, লীলার বড়দাদা তাহার জন্য একটা চীনামাটির পুতুল আনিয়াছে। সেই পুতুলটিই লীলার মেয়ে। ভোরে ঘুম ভাঙ্গিবার পর হইতে রাত্রে শোয়ার সময় পর্য্যন্ত ঐ পুতুল-মেয়ের জন্য লীলার কত কাজ! তেল মাখান, স্নান করান, কাপড় কাচিয়া দেওয়া, খাওয়ান, শোয়ান —আরও কত কি! নিজের খাওয়ার আর পড়ার সময়-টুকু ছাড়া সব সময় সে পুতুলের পরিচর্য্যাতেই মশগুল।

লীলারাণীর এহেন আদরের মেয়ের বিবাহ।

পাশের বাড়ীর পারুলেরও এক পুতুল-ছেলে আছে; সেইটি হইল মেয়ের বর!

সকাল হইতেই বৈঠকখানা-ঘরের পাশে শিউলীতলায় আশে পাশের দুই-তিন বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা

লীলা নিজেই পরিবেষণে লাগিয়া গিয়াছে

আসিয়া মিলিয়াছে—সমবয়সী লীলার মেয়ের বিবাহে উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ না করিলে চলে কি?

যথাসময়ে বিবাহ হইল। তারপর খাওয়ার পালা।

তাহারও অভিনব ব্যবস্থা হইয়াছে। কাদামাটির লুচি এবং দূর্ব্বাঘাস, কচি কচি আমপাতা, পেয়ারাপাতা প্রভৃতির রকমারি তরকারী ; তাহা ছাড়া, মাটির ডেলার সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতি মিষ্টি সামগ্রী ত আছেই !

সকলে বসিলে লীলা নিজেই কোমরে কাপড় জড়াইয়া পরিবেষণে লাগিয়া গিয়াছে। সকলের সাম্‌নেই এক একটি কচুপাতার উপর ঐ অভিনব খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হইল। লীলা বারংবার সকলের কাছে যাইয়া বলিতেছে —"খাও ভাই, খাও ; পেট ভ'রে খাও। আর দুটো সন্দেশ দেব ?—আর দু'খানা লুচি ?"

বেশ স্ফূর্ত্তির সহিত ভোজন-পর্ব্ব চলিতেছিল, এমন সময় লীলার সেজদাদা রণু আসিয়া বলিল—"এই মুখপুড়ী, সব সময় ত খেলা নিয়েই আছিস্। বলি, আর কোন খবর রাখিস্ ? আজ যে মামাবাবু এয়েছেন। কেমন সুন্দর সুন্দর খেলনা আর জামা এনেছেন, দেখ্‌বি ত আয়।"

রণুর কথার সঙ্গে সঙ্গেই পুতুল-খেলা সাঙ্গ হইল। পুতুল-বর ও পুতুল-ক'নেকে টিনের ভাঙ্গা বাক্সটিতে শোয়াইয়া রাখিয়া এবং বেয়ান পারুলের কাছে বিদায়

লইয়া, লীলারাণী হাসিতে হাসিতে ছুট্ দিল। অন্যান্য ছেলেমেয়েরাও নিজ নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেল।

রণু, লীলা প্রভৃতির মাতুল হরিচরণবাবু ছেলেপিলেদের বড় প্রিয়। কারণ তিনি তাহাদের সঙ্গে গল্প-গুজব করিতে খুবই ভালবাসেন। তাঁহার মুখের গল্প শুনিতে পাইলে ছেলেমেয়েরা যেন নাওয়া খাওয়া ভুলিয়া যায়।

হরিচরণবাবু বাংলাদেশে থাকেন না ; কার্য্য উপলক্ষে ধানবাদে থাকেন। প্রতি বৎসরই তিনি দুই-একবার দেশে আসেন এবং আসিলেই ভাগিনেয়-ভাগিনেয়ীদিগকে নিয়া কয়েকটা দিন আমোদ-আহ্লাদে কাটাইয়া যান।

এমন মামাবাবুর কথা শুনিয়া যে লীলারাণী খেলাধূলা ছাড়িয়া ছুটিয়া যাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি ?

... ...

দুইদিন পরের কথা।

ভাদ্র মাসের দিন। চারিদিক জলে ভরপূর। ঘাটে মাঠে—সর্ব্বত্র কেবল জলের খেলাই চলিয়াছে। ঘোষেদের বড় ঘরের বারান্দায় ছেলেমেয়েদের মেলা বসিয়া গিয়াছে। সেদিন রবিবার—ছুটির দিন ; পাঠশালার পড়ার ভাবনা নাই। ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। এই সময়ে

বাড়ীর ছেলেমেয়েরা হরিচরণবাবুকে ধরিয়া বসিয়াছে গল্প বলিবার জন্য। তাহাদের আবদারে তিনি মধ্যাহ্নের নিদ্রাসুখে জলাঞ্জলি দিয়া গল্প বলিতে বাধ্য হইলেন; বলিলেন—"আচ্ছা, আজ কি গল্প শুন্‌বি কানু ?"

কানু অমনি উত্তর করিল—"আজ ভূত-পেত্নী, না-হয় রাক্ষস-খোক্ষসের গল্প বলুন মামাবাবু।"

মিনু গম্ভীরভাবে বলিল—"না—না, 'য়্যাড্‌ভেঞ্চার'।"

টুনু একটু বিজ্ঞের মত বলিয়া উঠিল—"ওসব বাজে গল্প আমার মোটেই ভাল লাগে না। তার চেয়ে ঠাকুর-দেবতার গল্প বলুন মামাবাবু।"

এমন সময় লীলা বলিল—"একটু অপেক্ষা করুন মামাবাবু। আমার বেয়ানকে নিয়ে আসি।"

হরিচরণবাবু হাসিয়া বলিলেন—"সে আবার কি ? লীলুর বেয়ানটি আবার কে ?"

লীলার বড়দিদি সুশীলা বলিল—"ও-হরি! তা'ও বুঝি শোনেন নি মামাবাবু ? সেদিন যে পারুলের পুতুল-ছেলের সাথে লীলুর পুতুল-মেয়ের বিয়ে হ'য়ে গেছে!"

লীলারাণীর অনুরোধে কতক্ষণ অপেক্ষা করা হইল, কিন্তু সে ফিরিল না। রণু বিরক্ত হইয়া বলিল—"ও

আর এখন ফির্‌বে না মামাবাবু। ও হয়ত মেয়ে-জামাই নিয়েই মেতে গেছে।”

অগত্যা লীলার অনুপস্থিতিতেই হরিচরণবাবু গল্প বলিতে স্বরু করিলেন; বলিলেন—“আচ্ছা, আজ

তোমাদের রামের দুর্গাপূজার কথা বল্‌ব, শোন। কিজন্য রাম-রাবণে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, সে-কথা ত কাল তোমরা শুনেছ; মনে আছে নিশ্চয়ই। এ হ’ল তার পরের কথা।

"রাম-রাবণে ভীষণ যুদ্ধ চলেছে। লঙ্কার চারদিকে বানরেরা কিল্-কিল্ ক'রে ঘুর্ছে, আর রাক্ষসদের দেখ্তে পেলেই 'মার মার' শব্দে আক্রমণ কর্ছে। বানরেরা ত আর তীর-ধনু ধর্তে জানে না, তলোয়ারও ঘুরাতে পারে না, গাছ আর পাথরই তাদের সম্বল।

"যুদ্ধ ক'রে ক'রে রাবণের একলক্ষ ছেলে আর সওয়া লক্ষ নাতির প্রায় সবাই মরেছে। লঙ্কার ঘরে ঘরে মরা-কান্না প'ড়ে গেছে; আর পথে ঘাটে শেয়াল-শকুন মরার মাং[illegible] পেট ভরাচ্ছে। রাবণের বড় ছেলে ইন্দ্রজিৎ —যে দেবতাদের রাজা ইন্দ্রকে পর্য্যন্ত হারিয়ে দিয়েছে— সেও আর বেঁচে নেই। লক্ষ্মণ তাকে মেরে ফেলেছেন। কাজেই রাবণের মনে শান্তি নেই। মানুষের এক ছেলে ম'লে কেঁদে সারা হয়। রাবণের একটি নয়, দুটি নয়—লক্ষ পুত্র মরেছে। কেমন ক'রে সে স্থির থাকৃবে বল?..."

এই সময়ে গল্প-স্রোতে বাধা দিয়া টুনু বলিল— "তা বেশ মজাই ত হয়েছে। ও বেটা রাবণ সীতাকে নিতে গেল কেন? গুরু মশায় বলেছেন, 'পরের দ্রব্য লইতে নাই, না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়।' তাও

আবার কোন একটা জিনিসপত্রও নয়—একেবারে গোটা মানুষ চুরি করেছে! তার ত অমনটা হওয়াই উচিত।”

কানু টুনুকে ধমক দিয়া বলিল—“গল্প শুন্‌বি ত চুপ কর, আর পাণ্ডিত্য দেখাতে হবে না।” পরে মামাবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল—“তারপর কি হ’ল, মামাবাবু?”

এমন সময় “এই যে আমরা এসেছি” বলিয়া লীলা আর পারুল সেখানে আসিল। সুশীলা তাহাদিগকে চুপ করিয়া গল্প শুনিতে ইঙ্গিত করিল।

হরিচরণবাবু পারুলকে লক্ষ্য করিয়া [illegible] বলিলেন—“হ্যাঁ মা পারুল, তুমি বুঝি আমাদের লীলুর বেয়ান? তা বাছা, তোমরা তো খুব দেরী ক’রে ফেলেছ। গল্প অনেকটা হ’য়ে গেছে। আচ্ছা বাকীটুকু শোন।”

তিনি বলিতে লাগিলেন—“রাবণের ছেলে ইন্দ্রজিৎ, অতিকায়, বিভীষণের ছেলে তরণীসেন, কুম্ভকর্ণের ছেলে কুম্ভ-নিকুম্ভ—এসব বড় বড় বীরেরা মরেছে। কুম্ভকর্ণ, অহীরাবণ, মহীরাবণ, বীরবাহু প্রভৃতি যোদ্ধারাও আর বেঁচে নেই। লঙ্কা একেবারে বীরশূন্য। রাবণ নিরুপায়, কা’কেই বা আর যুদ্ধে পাঠায়? যুদ্ধ না কর্‌লেও ত রক্ষা নেই। অগত্যা রাবণ নিজেই সসৈন্যে যুদ্ধে চল্‌ল।

"যে সব রাক্ষস তখনও বেঁচে ছিল তা'রা সবাই চল্‌ল রাবণের সঙ্গে। ওদিকে রামের বানর-সৈন্যদের মধ্যেও 'সাজ সাজ' রব প'ড়ে গেল। রাক্ষস আর বানরের বীরদাপে লঙ্কা থর্‌-থর্‌ ক'রে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল! লঙ্কার পশ্চিম দুয়ারে সজোরে রণ-ডঙ্কা বেজে উঠ্‌ল।

"এদিকে রাক্ষসে বানরে যুদ্ধ। অন্য দিকে স্বয়ং রাম-রাবণের মধ্যে যুদ্ধ। কেউ কা'কেও হারাতে পাচ্ছে না। ওদিকে আবার হনুমান কি করেছে জান? সে রাবণের রথে [illegible] কীল-চড়ে তাকে নাকালের একশেষ ক'রে তুল্‌ল।

"রামের বাণে আর হনুমানের চড়-চাপড়ে অস্থির হ'য়ে রাবণ তীর-ধনু ছেড়ে দুর্গার স্তব কর্‌তে সুরু ক'রে দিল। রাবণ ছিল দুর্গাভক্ত। ভক্তের ডাকে দেবী আর স্থির থাক্‌তে পার্‌লেন না—কালীমূর্ত্তিতে রাবণের রথে এসে তাকে অভয় দিলেন। রাবণ আশ্বস্ত হ'য়ে আবার যুদ্ধ সুরু কর্‌ল।

"রাবণের রথে দেবীকে দেখে রামচন্দ্র খুব হতাশ হ'য়ে পড়্‌লেন; ভাব্‌লেন—আর বুঝি রাবণ বধ হবে না! স্বর্গের দেবতারাও ভয়ে 'হায় হায়' ক'রে উঠ্‌লেন।......"

এই সময়ে লীলা বলিল—“কেন মামাবাবু, দেবতাদের
ার ভয় কিসের ?”

“দেবতার কেন ভয় তা বুঝি তোমার মনে নেই !
তো সেদিনকার কথা। এখনই ভুলে গেলে ?”
া, সুশীলা হাসিয়া উঠিল। অন্য সকলেও সেই
তে যোগ দিল।

সকলে হাসিলেও রণু কিন্তু একটুও হাসিল না—
নক গম্ভীর হইয়া গেল।

হরিচরণবাবু বলিলেন—“একথার মানে কি সুশী’ ?
মরা সবাই হাস্‌ছই বা কেন ? আর রণুই বা এমন
ার হ’য়ে গেল কেন ?”

সুশীলা উত্তর করিল—“সে আর কিছু নয় মামাবাবু !
দিন আগের কথা—সেদিনও কিসের ছুটি ছিল।
ার পর, ঠাকু’মা ব’সে মালা জপ্‌ছিলেন, আর লীলু
সাম্‌নে ব’সে কি একটা স্তব মুখস্থ কর্‌ছিল। এমন
য় সেখানে গিয়ে হাজির হ’ল শ্রীমান রণু।

“রণু সেখানে গিয়েই লীলুকে বল্‌লে—‘এই কানামাছি
বি ?’ লীলুর কিন্তু সেদিকে মন ছিল না—রণুর
ায় সাড়া দিলে না। রণু আবার খেলার কথা বল্‌লে,

তবু লীলু তার কথার জবাব দিলে না। তাতে রণু
বিষম রাগ। সে লীলুর গালে দুই চড় দিয়ে বল্ল
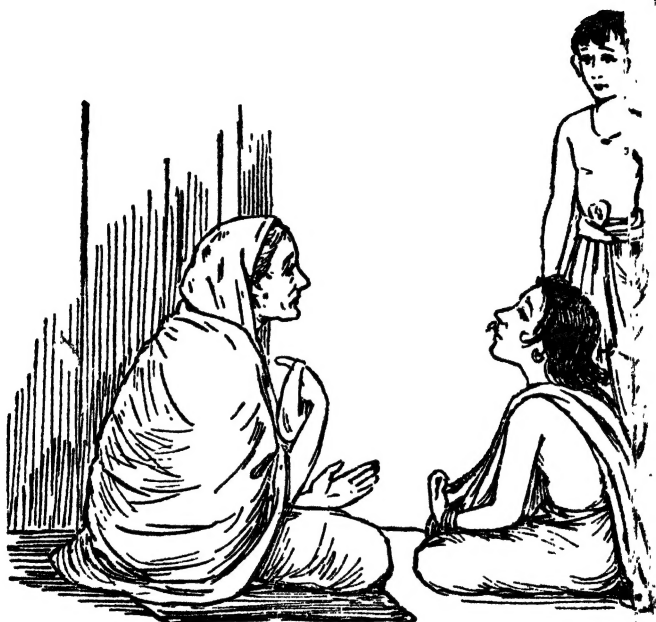
রুণু বল্‌লে—'এই কানামাছি খেল্‌বি ?

'আমি হলুম গিয়ে তোর বড়ভাই—গুরুজন—দে
মত। আমাকে অগ্রাহ্য ক'রে ভারি ত স্তব পড়া হ
"সে-কথা শুন্‌তে পেয়ে মা রণুর 'দেবতা-গিরি'